

ত্রয়োদশ বর্ষ । তৃতীয় সংখ্যা  
জুন - সেপ্টেম্বর ২০২৫

# পূর্ত কথা

Purta Katha





বাংলা শিশু সাহিত্যে চির জীবন সাধনা ও অনন্য কৃতিত্বের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে অশোক কুমার মিত্র-কে বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার ভূষিত করা হয়। ১৪৩২-এর নববর্ষের অপরাহ্নে রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রনীল সেন শ্রী মিত্রের হাতে পুরস্কার স্মারক তুলে দিচ্ছেন।  
শ্রী মিত্র হলেন পূর্তকথার প্রথম নির্বাহী সম্পাদক ও বর্তমানে উপদেষ্টা।

ছবি— নন্দিতা মিত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

জুন—সেপ্টেম্বর ২০২৫

### সম্পাদকমণ্ডলী

পুলক রায়	সভাপতি
অন্তরা আচার্য	সম্পাদক ত্রয়ী
দিলীপকুমার বৈদ্য	সম্পাদক ত্রয়ী
প্রশান্ত সাহা	সম্পাদক ত্রয়ী
মুস্তারব হুসেন	সদস্য
সুস্মিত ব্যানার্জী	সদস্য
রাজীব চট্টরাজ	সদস্য
শুভাশিস বিশ্বাস	সদস্য
বিনীত গুপ্তা	সদস্য
পার্থ নাথ	সদস্য
অমিত কুমার বিশ্বাস	সদস্য

### উপদেষ্টামণ্ডলী

অমিয়গোপাল মণ্ডল
মনীষা রক্ষিত
শ্যামাপ্রসাদ দত্ত
অশোককুমার মিত্র

### নির্বাহী সম্পাদক

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

### সম্পাদনা সহায়ক

রাজীব গুপ্তশর্মা
সঞ্জয়কুমার নন্দী

প্রচ্ছদ শিল্পী: সুরজিৎ পাল

প্রচ্ছদ লিপি: প্রণবশ মাইতি

প্রথম প্রচ্ছদ: পাহাড়ি সড়ক, দার্জিলিং

চতুর্থ প্রচ্ছদ: পাহাড়ি সড়ক, রোহিণী  
ছবি- সুরত হাইত

পূর্ত বিভাগের পক্ষে  
সচিব অন্তরা আচার্য কর্তৃক  
নবান্ন, হাওড়া-৭১১ ১০২ থেকে  
প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বসুমতী  
কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬,  
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,  
কলকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত

### যোগাযোগ :

Email: purtokotha@gmail.com

Website: pwd.wb.gov.in

# দূর্ঘ দ কথ্য

পূর্ত, পূর্ত (সড়ক) ও  
পূর্ত (সামাজিক শাখা)  
বিভাগের মুখপত্র

### বিষয়সূচি

আমাদের কথা	২
অতীত দিনের স্মৃতি কল্যাণকুমার বিশ্বাস	৩
Fascinating History of Hill Cart Road: new NH-110 (old NH-55)—way to Darjeeling, and its present crisis Rajib Chattaraj Debabrata Thakur	১৬
Collapse of Baltimore Bridge and wake-up calls for Indian Engineers Sanjoy Kumar Nandi	৩১
Environmental Management For Construction Site With Particular Reference To Multipurpose Cyclone-Shelter (MPCS) In Coastal Districts Of West Bengal Biswajyoti Sahoo Kausik Banerjee Tapan Kumar Pusti	৩৮
83rd Annual Session of Indian Roads Congress held during 8th to 11th November, 2024 at Pandit Dindyal Upadhyay Auditorium & Science College Ground, GE Road Raipur, Chhattisgarh : A brief Report Anupam Karmakar	৪৪
স্মৃতিকথন—তরণ ভট্টাচার্য	৪৮

# আমাদের কথা

আমাদের সবার প্রিয় পূর্তকথা পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি এক অর্থে এক শুভ লগ্নে প্রকাশ পেতে চলেছে। কারণ এই সময়ে বর্ষার মেঘসঞ্চয়ের মাধ্যমে যে বাংলার আকাশ-বাতাস-প্রান্তর জুড়ে নব সৃষ্টির সঙ্গীত শুধু নয়, এই মাসেই বাংলার এমন এক স্রষ্টা সন্তানের জন্ম—প্রকৌশলী হিসাবে যাঁর অক্ষয় কীর্তি ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে স্থাপিত হলেও সগর্বে কালের করাল গ্রাসকে উপেক্ষা করে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। সেই কীর্তিরাশির সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ তালিকা পেশের প্রয়াসে শুধুমাত্র এই পাতাটি নয়, পূর্তকথার এই সংখ্যার জন্য বরাদ্দ সব কয়টি পাতা নিঃশেষিত হবার আশঙ্কা। তাঁর নাম স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি—জন্ম বর্তমান উত্তর ২৪-পরগনার এক অখ্যাত গ্রাম ভাবলাতে ২৩ জুন, ১৮৫৪ সালে এক দরিদ্র পরিবারে। পরবর্তীতে সেই গ্রামকেই শুধু নয়, মহানগরীর লাগোয়া হাওড়া ও দুই ২৪-পরগনার বহু গ্রামকে তিনি মার্টিন রেলের মাধ্যমে সংযুক্ত করে সেগুলির অবিশ্বাস্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। এছাড়া রয়েছে হুগলি নদীর রবীন্দ্র সেতু, পলতা পানীয় জল প্রকল্প, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, বি ই কলেজ শিবপুরের জলঘড়ি, এলাহাবাদ ও কানপুরের জল প্রকল্প, বার্নপুরে ইঞ্জের ইম্পাত শিল্প। তালিকা দীর্ঘ বা সম্পূর্ণ হল কিনা এখানে বড় কথা নয়, তার থেকে বড় হল এই আত্মজিজ্ঞাসা যে, নিজেরা একই শিক্ষা ও পেশায় থেকে এই পূর্বসূরিকে কার্যত ভুলে থাকার কারণ কী!

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে তাঁর সমকালে স্বক্ষেত্রে তাঁর যে সুউচ্চ কীর্তি রয়েছে—তার পাশে বাকি অনেককেই ক্ষুদ্র বলে মনে হবে, অন্তত পূর্ব ও উত্তর ভারতে। দক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে ডঃ বিশ্বেশ্বরায়ীয়া খানিক তুলনীয় হতে পারেন—যিনি পূর্ত বিভাগে ও পরে উপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রশাসনে কর্মরত থেকে নিজের প্রকৌশলের সফল প্রয়োগ ঘটান। পক্ষান্তরে স্যার মুখার্জি প্রায় প্রথমাবধি ব্রিটিশ শিল্পপতির সঙ্গে ‘সমান যৌথ অংশীদারীর’ পথে অগ্রসর হয়ে সফলভাবে একের পর এক উদ্ভাবনী প্রকৌশলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। যতদূর জানা যায় যে বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কোনো কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রকৌশলীর মর্মরমূর্তি তো দূরের কথা বর্তমানে একটি ছবি পর্যন্ত নেই, হয়তো অতীতে কখনও ছিল! এটি যে ভারতীয়দের, বিশেষত বাঙালির পক্ষে এক লজ্জার বিষয়—এ বিষয়ে আশা রাখি প্রতিটি সুধী পাঠক একমত হবেন। সুতরাং যত দ্রুত ও যেভাবে সম্ভব এই ত্রুটি সংশোধনে আমাদের সচেষ্টিত হওয়া উচিত।

কিন্তু এমন বিস্মরণ ঘটে গেল কী করে—এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানও সমান জরুরি। অনেকেই আমরা বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতনে উৎসব ইত্যাদিতে যতটা আগ্রহী, তৎসংলগ্ন শ্রীনিকেতন প্রাপ্তগে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত পল্লী-পুনর্গঠন ও কারিগরি-নির্ভর স্বনির্ভরতার কর্মকাণ্ডে ততটাই অনাগ্রহী। ‘শিল্প’ শব্দটি শিল্পকলা ও শিল্প-বাণিজ্য এই উভয় অর্থেই প্রযোজ্য। অথচ বাংলার নবজাগরণের উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের স্বনির্ভর শিল্পোদ্যোগের দিকটি আমরা হেলায় হারালাম। ভুলে গেলাম যে, এই লাঞ্ছিত, পরাধীন জাতির সামনে নতুন পথ যারা উন্মোচন করেছিলেন সেই তালিকা কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকারেই শেষ মোটেই নয়, যজ্ঞাগ্নিকে জ্বালানি সরবরাহকারী স্যার রাজেন্দ্রনাথ, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডঃ নীলরতন সরকার, আলামোহন দাশ, সুরেন্দ্রমোহন বোস প্রমুখকে সম্মানে যুক্ত করলে তবেই সম্পূর্ণ হবে। কারিগরির দেবতা বিশ্বকর্মা কে ব্রাত্য রেখে কি বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সংসার নির্বিঘ্নে চলতে পারে, না চলা উচিত!

প্রার্থনা করি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর অগণিত গুণমুগ্ধ ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিক উদ্যোগে এই স্বপ্ন অচিরেই বাস্তবায়িত হবে।

আসন্ন রাশীবন্ধন উৎসবের শুভলগ্নে পূর্তকথার পাঠকবর্গকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।



# অতীত দিনের স্মৃতি

কল্যাণকুমার বিশ্বাস

অবসরপ্রাপ্ত বাস্তুরকার প্রধান ও পদসূত্রে সচিব, পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগ

## মুখবন্ধ

আজ থেকে প্রায় ৭০/৭৫ বছর আগে দেশ স্বাধীন হবার পরে পরেই পূর্ত বিভাগের একজন সহকারী বাস্তুরকারকে দুর্গম জায়গায় ব্রিজ ও রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে কী বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল তার কিছু কিছু টুকরো ঘটনার কথা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে। সেই সময়কার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গে যেতে হলে অনেক ঘুরে বিহারের মধ্য দিয়ে যেতে হত। ফরাক্কা ব্যারেজ তখনও তৈরি হয়নি। সক্রিগলি ঘাটে গিয়ে ফেরিতে গঙ্গা পার হয়ে ট্রেন ধরতে হত। সেই সময় মহারাজার আমলের কোচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সবে যুক্ত হয়েছে। লেখককে কোচবিহার-আসাম সীমান্তে নতুন সেতু ও রাস্তা নির্মাণ করতে বদলি করা হয়েছিল। পরে কোচবিহারে বদলি করা হয়। সেই সময়ে দুর্গম জায়গায় থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং কাজ ছাড়াও অবসর সময় কীভাবে কাটাতে হত—এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে বদলি হতে তখনকার দিনে কোনো ইঞ্জিনিয়ার চাইতেন না। এখনও সাধারণভাবে বোধহয় উত্তরবঙ্গে কেউ বদলি হতে চান না। একবার উত্তরবঙ্গে গিয়ে পড়লে কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগে না। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও ওখানে কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। আমি মনে করি যে পূর্ত বিভাগের একজন পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে উত্তরবঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত দরকার।

## উত্তরবঙ্গে যখন আমায় বদলি করা হল :

উত্তরবঙ্গে যখন আমাকে বদলি করা হয় তখন আমি পূর্ত বিভাগের একজন সহকারী বাস্তুরকার। পূর্ত বিভাগের মুখ্য বাস্তুরকারের ড্রয়িং অফিসের সঙ্গে যুক্ত থেকে তখন রাইটার্স বিল্ডিংসের ই-ব্লকের “আর সি ফ্রেমড স্ট্রাকচার” ডিজাইন করছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। দেশভাগের পর অনেক রাস্তা ও সেতু করার দরকার। পূর্ত বিভাগ হতে আলাদা করে সড়ক উন্নয়ন অধিকার তৈরি করা হল। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় উত্তরপ্রদেশ হতে সেখানকার মুখ্য বাস্তুরকার সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে সড়ক অধিকারের মুখ্য বাস্তুরকার করে নিয়ে এলেন। তিনি অনেক রাস্তার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ একদিন ড্রয়িং অফিসে এসে আমার মতো একজন অতি নবীন বাস্তুরকারকে বললেন যে একটা পন্টুন ব্রিজ করব। তুমি একটা ডিজাইন করে দাও। তিন টন লরি যাবে আর চক্রাকারের পন্টুন হবে। ১৫ ফুট লম্বা ১৫" X ৫" জয়েন্ট আছে সুতরাং পন্টুনগুলো ১৫ ফুট অন্তর অন্তর থাকবে। বাওয়েন্সি হিসাব করে একটা ৫ ফুট ব্যাসের পন্টুন আঁকলাম। কিন্তু চক্রাকার হওয়ার জন্য মেটা-সেন্টারটা ঠিকমতো আসছে না। আমি চক্রবর্তী সাহেবকে বললাম যে মেটা-সেন্টারটা মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র হতে নীচে হয়ে যাচ্ছে, ঠিকমতো থাকছে না, আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ নৌকার মতো ডিজাইন করে দেব? তিনি বললেন যে উত্তর প্রদেশে গঙ্গার উপর চক্রাকার অনেক পন্টুন ব্রিজ আছে। বার্জ-এর মতো পন্টুনগুলো করতে হলে জাহাজ নির্মাতার কাছে যেতে হবে। তাতে খরচ বেশি আর সময়ও বেশি লাগবে। আমি একটা পন্টুন ব্রিজের নকশা করে দিলাম। তারপর কী হল জানি না।

অবশ্য সেই পন্টুন ব্রিজটির দেখা পেয়েছিলাম ২৫/২৬ বছর পরে। তখন আমি পূর্ত (সড়ক)-এর মুখ্য বাস্তুরকার। মুর্শিদাবাদ জেলায় গিয়ে দেখতে পেলাম যে জলঙ্গি বা ওই রকম একটা নদীর ওপর পন্টুন ব্রিজের ওপর দিয়ে যাত্রী নামিয়ে বাসগুলো পার হচ্ছে। পন্টুনগুলো খুব টলমল করছে। খুব বাজে ডিজাইন।

যে কথা বলছিলাম, একদিন আমাকে কোচবিহারে বদলি করা হল। ভেবেছিলাম যে ডিজাইন ডিভিশনে পোস্টিং পাব। কলকাতার জীবনটা ভালোই লাগছিল। ১০-৫টা অফিস। শনিবারে হাফ আর রবিবারে পুরোদিন ছুটি। রাইটার্স বিল্ডিংসে কাজ করি। ছোটো খাটো গেজেটেড অফিসার ১৫ আগস্ট ও ২৬ জানুয়ারিতে রাজভবন থেকে নিমন্ত্রণ পাই (এখন বোধহয় অধীক্ষক বাস্তুরকারের নীচে কাউকে ডাকা হয় না)। তাই কলকাতা ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু কাকে ধরে বা তদ্বির করে বদলির আদেশ রদ করা যায়—তা জানা ছিল না। অতএব ১৯৫০ সালের এক সকালে একটা সুটকেসে জামাকাপড় আর কম্বল মশারি নিয়ে কোচবিহারে পৌঁছলাম। কালজানি ব্রিজ কম্পট্রাকশন উপভুক্তির সহকারী বাস্তুরকার হিসাবে যোগদান করলাম। তখনকার আসাম অ্যাকসেস রোড, এখন যাকে ৩১নং জাতীয় সড়ক বলা হয়, সেই রাস্তার উপর কালজানি, রায়ডাক-১ ও গদাধর নদীর উপর নির্মাণ করতে হবে। আপাতত কালজানি নদীর মধ্যে কুপ বসিয়ে বসিয়ে সেতু গড়া হবে। এখন গাড়ি পারাপার করে ফ্লাইং ফেরির সাহায্যে। যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী এই পন্টুন তৈরির ব্যবস্থা করেছিল। নদীর দুপারে বেলি টাওয়ার করে তাদের মাথায় এপার ওপার তারের রশি বাঁধা। সেই তারের রশিতে পুলির সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম পন্টুন ফেরি পারাপার করত।

পূর্ত বিভাগের লরিতে টিন বাঁশ তাঁবু নিয়ে ওভারসিয়ার বাবুদের সঙ্গে করে সেতুর নির্মাণস্থলে হাজির হলাম। ঠিকাদার ছিল হিন্দুস্থান কম্পট্রাকশন কোম্পানি। তারা তাদের লোকজনের থাকার জায়গা, গোড়াউন, ওয়ার্কশপ, সাইট-অফিস প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছে। আমরাও তাঁবু খাটিয়ে, টিনের চালা করে অফিস খুলে বসলাম। আসাম সীমান্ত হচ্ছে এখান হতে মাইল দশেক দূরে।

সেতুর কাজ শুরু হয়ে গেল। নির্মাণের জন্য মালমশলা সব আসতে লাগল। আমরা সদরের ওভারসিয়ার বাবুদের কাছ হতে জেনে এসে বিভিন্ন রকম ফর্ম-এ অ্যাকাউন্ট রাখতে লাগলাম। হিন্দুস্থান কম্পট্রাকশন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা সেতু নির্মাণ করে করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছে। কুপগুলোর লে-আউট দেবার জন্য নদীর ধার বরাবর পথরেখার সমকোণে স্প্যান মেপে মেপে পিলার বসানো হল। এবার পথরেখায় থিওডোলাইট বসিয়ে এবং আর একটা থিওডোলাইট নদীর ধারে এক নম্বর স্প্যানের পিলারের উপর বসিয়ে ৪৫° কৌণিক রেখায় দেখলাম যখন নদীর মধ্যে বাঁশ দুটো থিওডোলাইট থেকে একইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে তখন সেই বাঁশটা একনম্বর কুপের কেন্দ্র হবে। সেখানে দ্বীপ গড়ে



কালজানি নদীতে কুপ বসানো

কাটিং এজ বসানো তারপর কুপের কার্ব ঢালাই। কুপগুলো ছিল ডাম্বেল আকারের যমজ কুপ। ওয়েল কার্ব-এর কংক্রিটের জন্য প্রয়োজনীয় মালমসন্নার হিসাব করতে ভালোরকম পরিমাপ বিষয়ক জ্ঞান প্রয়োজন হত। প্রত্যেক কুপের আলাদা লগবুক থাকতো। তাতে প্রতিদিনের শেষে দুটো থিওডোলাইট দিয়ে প্রত্যেক কুপের প্রত্যেকদিনের বসানোর পরে কুপের পরিবর্তনের মাপ রেকর্ড করা হত। দিনের শেষে কুপের জলতলের মাপ নেওয়া হত। আবার পরের দিন সকালে বসানো শুরু হওয়ার আগে আবার জলতলের মাপ নেওয়া হত। যা তফাৎ পাওয়া যেত সেটা হল কুপের নিজে নিজে বসে যাওয়া, তাই ওই পরিমাণ বসানোর জন্য ঠিকাদারের কোনো পয়সা পাওনা হবে না। কুপের লগবুকে লোহার রড কত ব্যবহৃত হয়েছে, কত সিমেন্ট লেগেছে, কত কংক্রিট তৈরি হয়েছে তার হিসাব রাখা হত।

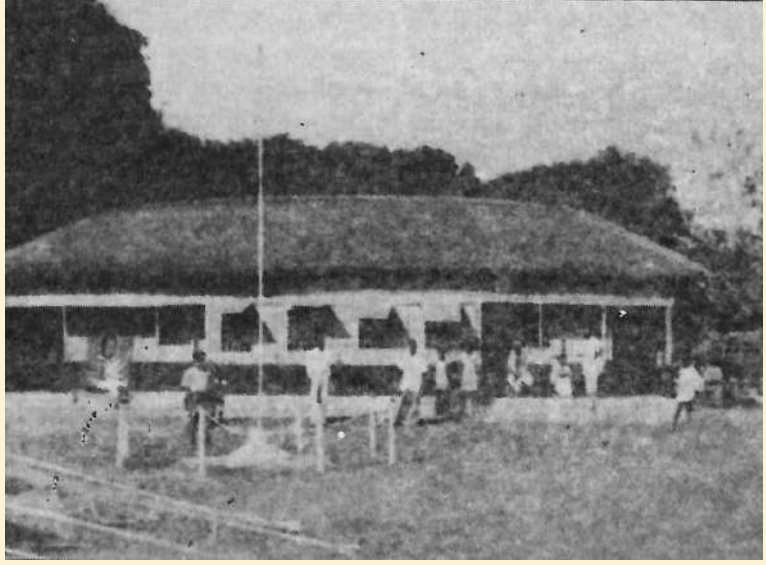
সারাদিন কাজের মধ্যে কেটে যেত। সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে একা একা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বসে থেকে কী করব? কালজানি নদীতে স্নান করতে করতে দেখতে পেতাম যে ছোটো ছোটো মাছ খেলা করছে। কিছু দূরে চিলাখানাতে সপ্তাহে দুদিন হাট বসত। সেখানে একদিন হাট থেকে ২০ টাকা দিয়ে একটা মাছ ধরার ‘খেপলা’ জাল কিনে ফেললাম। আমরা অফিসের সামনে মাঠের উপর জাল ফেলা অনুশীলন করতে লাগলাম। জালটাকে গোল হয়ে ছড়িয়ে ফেলতে হবে। অ্যামিবার মতো চেহারা হলে চলবে না। মাছ কম ধরা পড়বে। সন্ধ্যার পর মাছগুলো ডাঙার দিকে আসে। সেই সময় কালজানি নদীতে মাছ ধরতাম। ২০/২২টা চিংড়ি, পুঁটি, বেলে মাছ পেতাম। তাতে আমাদের অফিসের ৫/৬ জনের দিব্যি মাছ ভাজা হয়ে যেত। আমাদের দেখাদেখি ঠিকাদারের লোকেরাও মাছ ধরতে শুরু করল, ফলে কিছুদিনের মধ্যে মাছগুলো ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

তাঁবুতে থাকতাম। কিন্তু বর্ষাকালে বড়ো অসুবিধা হত। সেকথা পূর্তকথার আগের সংখ্যায় লিখেছিলাম। জোঁকের উপদ্রব ছিল, আর বৃষ্টি হলে তাঁবুর মধ্য দিয়ে জল পড়ত। রাতে বালতি গামলা নিয়ে শুয়ে থাকতাম যাতে ভিজে না যাই। বৃষ্টি হলেই তাপমাত্রা কমে যেত। একদিন বৃষ্টির রাতে কন্ডল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। যেখান দিয়ে তাঁবুর মধ্যে দিয়ে জল পড়ছে, সেখানে বালতি গামলা পেতে রেখেছি। রাতে হঠাৎ হাড় চিবানোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁবুর বাইরে বের হবার ইচ্ছা করল না। ওখানে সকাল হলেই বৃষ্টি থেমে যায়। সকালে আমার পিয়ন এসে বলল যে একটা আধখাওয়া বাছুর তাঁবুর পাশে পড়ে আছে। কিসে খেয়েছে কে জানে? রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ওখানে নেই, হয়তো কোনো বড়ো চিতা বাছুরটাকে নিয়ে এসে খেয়েছে। নেকড়েরা সাধারণত কুকুর ছাগল খায়। মানুষখেকো হলে আলাদা কথা। তাঁবুর আশে-পাশে কোনো জঙ্গল নেই। বোধহয় তাঁবুর আড়ালটা বাঘের পছন্দ হয়েছিল। আধখাওয়া বাছুরটাকে কে সরাবে? একটু পরেই তো শকুন এসে বসবে। সুতরাং আমরা আমাদের পুরো ক্যাম্পটা দূরে সরিয়ে নিলাম।

কালজানি সেতুর কাজ শেষ হল। ক্যালেন্ডার হ্যামিলটন গার্ডার বসিয়ে এসেছিলাম, পরে তাতে আর সি ডেক বসানো হয়। এবার রায়ডাক ও গদাধর নদীর উপর সেতু করতে হবে। তার সঙ্গে বঞ্জিরহাট হতে জোড়াই পর্যন্ত ১১/১২ মাইল নতুন রাস্তা। তুফানগঞ্জ অফিস নিয়ে আসা হল। কালজানি সেতু নির্মাণ উপভুক্তির নাম বদলে হল তুফানগঞ্জ নির্মাণ উপভুক্তি।

১নং রায়ডাক নদীর ধারে অফিস। সেখানে সেতু তৈরি করতে হবে। এক মাইল দূরে তুফানগঞ্জ শহরে আমাদের ক্যাম্প মাটির মেঝে, দরমার বেড়া আর খড়ের চাল। ব্যারাক মতো বাড়ি, এক একটা ঘর এক এক জনের। তিনজন ওভারসিয়ারবাবু, একজন উপভুক্তির কেরানিবাবু, আর দুটো পিওন।

তুফানগঞ্জ শহরটাকে একটা বড়ো গ্রাম বললেই ভালো হয়। মহকুমা শাসকের অফিস ছাড়া সব টিনের চালের বাড়ি। কয়েকজন লোকের বাস। একটা থানা আর হাসপাতাল আছে। বলতে গেলে অধিকাংশ বাসিন্দারাই, সরকারি কর্মচারী, কোন ক্লাব বা আড্ডা দেবার জায়গা নেই। বিকালের পর সময় কাটতে চায় না। মহারাজার আমলে একজন শিকারি ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করে তুফানগঞ্জে থাকেন। তাঁর নামটা ভুলে গিয়েছি। মহারাজার আমলে তার কাজ ছিল যে মহারাজার অতিথি এলে তাঁদের সঙ্গে শিকারে যাওয়া। এই অতিথিরা হলেন কেউবা লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা গায়কোয়াড়ের মহারাজা বা জয়পুরের যুবরাজ। রাজারা তাঁদের নিজস্ব শিকারি নিয়ে আসতেন। কিন্তু সদ্য বিলেত থেকে



তুফানগঞ্জে আমাদের আস্তানা

আসা মেম বা সাহেবদের জন্য ওই শিকারি ভদ্রলোকের কাজ ছিল যে হাতির পিঠে সাহেব বা মেমদের পিছনে বসে থাকে। ওঁরা গুলি করলে তা যদি ফসকে যায় তো ওই শিকারিবাবুকে গুলি করে জন্তটাকে মারতে হবে এবং বলতে হবে যে ওঁনারা মেরেছেন। শিকারি ভদ্রলোকটি খুব ভালো গল্প বলতে পারতেন। তার একটা উইনচেস্টার-৭স্ট রিপিটার ১২ বোর বন্দুক ছিল। দোনলা বন্দুকে যেমন পরপর দুটো গুলি করা যায় সেইরকম ওই বন্দুক দিয়ে পরপর সাতটা গুলি করা যেত। ওইরকম বন্দুক উড়ন্ত হাঁস বা পাখি মারার কাজে লাগে।

বক্সিংহাট হতে জোড়াই রেল স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হয়ে গেল। রাস্তাটা আসাম অ্যাকসেস রোড, এখন যাকে ৩১নং জাতীয় সড়ক বলা হয় সেখান থেকে শুরু। সিদ্ধানন্দদা (সিদ্ধানন্দ চাটার্জি) জরিপ করার সময় রাস্তা শুরুর চিহ্ন হিসাবে একটি খুঁটি মেরে রেখেছিলেন, সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। সি এস ম্যাপ-এর জমির আলগুলো বন্যায় বালি চাপা পড়ে গিয়েছে। শুধু জরিপের প্লানে লেখা আছে যে একটা গ্রামীণ সড়ক ৩১নং জাতীয় সড়ক হতে বেরিয়েছে—সেখান হতে ৩০০ ফুট দূরে জোড়াই রাস্তার শুরু। সেইমতো থিওডোলাইট দিয়ে ম্যাগনেটিক বিয়ারিং নিয়ে পথরেখার কাজ শুরু করলাম। ঠিকাদারের লোকেরা এসে পড়েছে। তারা ডাগবেলিং করে রাস্তায় মাটি ফেলতে শুরু করে দিল। কোনো রেফারেন্স পয়েন্ট নেই। কোথাও সি এস ম্যাপ অনুযায়ী জমির আল বা সীমানা দেখা যাচ্ছে না। শুধু জরিপ প্লানের বিয়ারিং অনুযায়ী আমরা থিওডোলাইট দিয়ে বিয়ারিং নিয়ে এগোতে লাগলাম। মাইল ৩/৪ পরে ভইসকুচি নামে একটা গ্রাম। গ্রামের বাইরে দিয়ে পথরেখা যাচ্ছে। সেখানে একটা বড়ো বাঁক রয়েছে। বাঁকের এক মাথায় তো পৌঁছেছি যদিও কোথাও কোনো রেফারেন্স পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে না। বাঁকের অন্য মাথাটা বোঝা গেল না। প্লটগুলো সব বালি আর ঘাসে ঢাকা। ঘাস মানে হাতিঘাস—এক মানুষের চেয়েও উঁচু। প্লট খুঁজে পাওয়া যাবে না। জরিপ প্লানের বাঁকটা মেপে নিলাম। তারপর থিওডোলাইট দিয়ে কৌণিক মাপ নিয়ে বাঁক সেট করলাম। তারপর পথরেখাটি সোজা সরল রেখায় টেনে থামলাম গিয়ে ২নং রায়ডাক নদীর ধারে।

এবার নদী পার হয়ে জোড়াই পর্যন্ত পথরেখা টানতে হবে। আমরা জোড়াই রেল স্টেশন চলে গেলাম। আসাম রেল লিংক' লাইনের উপর জোড়াই একটি স্টেশন। জনমানবহীন জায়গা। উদ্ভাস্ত্রদের সেটলমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে। যে পর্যন্ত আমরা পথরেখা দিয়েছি সেখানে ঠিকাদারের লোকেরা ডাগবেলিং করে বাঁশ পুঁতে দড়ি দিয়ে ১ : ২ মাপে ঢাল ঠিক করে পথের ধারের জরিপ প্লানের উচ্চতা অনুযায়ী মাটি ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসতে লাগল।

জোড়াই-তে রাস্তা শুরুর পয়েন্টটির কোন হদিস নেই। সেখানেও জরিপ প্লান অনুযায়ী স্টেশনের বাইরের সিগন্যাল পোস্টের ৫০০ ফুট দূর থেকে রাস্তা শুরু করলাম। জরিপ প্লান থেকে বিয়ারিং নিয়ে পথরেখা দিতে লাগলাম। এখানে সি এস ম্যাপ-এ দেখলাম যে লেখা আছে আনডিমার্কেটেড অর্থাৎ চিহ্নিতকরণ হয়নি মানে ক্যাডেস্ট্রাল জরিপ হয়নি। সমস্ত জায়গাটা বেঘো ঘাস বা হাতিঘাসে বোঝাই, কিছু দেখা যায় না। বাঁশ পুঁতে বাঁশ দেখে দেখে এগোতে হয়। থিওডোলাইট দিয়ে বিয়ারিং নিয়ে ড্রয়িং অনুযায়ী পথরেখা বরাবর বাঁশ পুঁতে এগিয়ে গেলাম, আর এসে পড়লাম ২নং রায়ডাক নদীতে।

দেখা গেল আমাদের পথরেখা আউট হয়ে গিয়েছে। ২/১ ফুট নয়, প্রায় ২০০ ফুট। রাস্তায় মাটি ফেলা শুরু হয়ে গেছে। নতুন করে পথরেখা দেওয়া যাবে না। সুতরাং একটা এস-কার্ড করে মিলিয়ে দিলাম।

ডিভিসন অফিস হতে অনেক দূরে কাজ করছি। যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নেই। ঠিকাদারের ২০০/৩০০ লোক মাটি ফেলতে ফেলতে আমাদের পেছন পেছন তাড়া করছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা যাচ্ছে না। অতএব আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। জরিপের সহকারী বাস্তুকার সিদ্ধানন্দদা বললেন যে, সবই তো মহারাজার জমি মানে এখন সরকারি জমি এবং জঙ্গলের মধ্যে রাস্তার পথরেখার এদিক ওদিক হলে কোনো ক্ষতি নেই।

এদিকে ওই রাস্তার পথরেখা নিয়ে যখন আমরা ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি সেই সময়ে আমাদের ক্যাম্প থেকে একটা কুকুর বাঘে নিয়ে গেল। বাঘ মানে চিতা বাঘ। দুটো কুকুর পুষেছিলাম। একটা আমার—নাম তার ভুলো। আর একটা ওভারসিয়ারবাবুদের। তার নাম কালো। ভূটিয়া কুকুর। দেখতে বেশ ভালো। এক সন্ধ্যায় টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রান্নাঘরটা একটু দূরে। আমাদের পিওনটা রান্নাঘর থেকে কুকুর দুটোকে খেতে ডাকছে। ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার সময় কোথা থেকে একটা চিতা বাঘ এসে কালোকে নিয়ে চলে গেল। পিওনটা শুধু কুকুরের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। সেই রাতেই খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলাম। কিছুই পেলাম না। পরের দিনেও খোঁজাখুঁজি করে কুকুরটার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। শিকারি ভদ্রলোককে ডাকলাম। তিনি বললেন যে একটা বন্দুক কিনে ফেলুন। আপনাদের আর একটা কুকুর তো আছে। চিতা বাঘ কুকুর খেতে খুব ভালবাসে।

ওর পরামর্শটা ভালোই লাগল। তাছাড়া ওয়ালেঙ্কি দাদার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি গঙ্গায় হাঁস শিকার করতেন। মিঃ ডোনাল্ড ওয়ালেঙ্কি দপ্তরে মেকানিক্যাল-এর সহকারী প্রযুক্তিবিদ। কলেজ জীবনে আমার তিন বছরের সিনিয়র ছিলেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইউরোপিয়ান হস্টেলে থেকে পড়তেন আর মাঝে মাঝে বিকেলে আমাদের স্নেস্টার হোস্টেলে এসে মুড়ি খেতেন। তাঁর কাজ ছিল ফরাক্কায় এল সি টি (ল্যাভিং ব্র্যাফট) গুলোর দেখাশুনা করা। এই এল সি টি দিয়ে সেই সময় ফরাক্কায় লরি পারাপার করা হত। তাছাড়া পূর্ত (সডক)-এ কিছু লঞ্চ আর বার্জ ছিল। সেগুলো দিয়ে কলকাতা থেকে ফরাক্কায় কয়লা নিয়ে যাওয়া হত। এই কয়লা দিয়ে মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট প্রভৃতি জায়গায় ইটভাটা করে, সেই ইট ও ঝামা দিয়ে সেকালে রাস্তা তৈরি হত। ওয়ালেঙ্কি দা অবশ্য পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান।

কোচবিহারে অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে একটা বন্দুকের লাইসেন্স বার করে নিলাম। এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর বন্দুকটা বিক্রি করতে চাইলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) চলে গিয়েছেন। তার কাছ থেকে ৫০০ টাকায় বন্দুকটা কিনে নিলাম। ৫০০ টাকার রশিদটা দেখিয়ে সদরের মালখানা থেকে বন্দুকটা নিয়ে এলাম। বি এস এ হ্যামারলেস ডাবল ব্যারেল গান।

এদিকে গদাধর নদীর ব্রিজের কাজ প্রায় শেষের দিকে। রায়ডাক নদীর উপর ব্রিজের কাজ শীঘ্রই শুরু করতে হবে। জোড়াই রাস্তার মাটির কাজ চলছে। এমন সময় এক শনিবার বিকালে পান মামুদ এসে হাজির। পান মামুদের ঘানি আছে। সে মাঝে মাঝে আমাদের সরিষার তেল দেয়। তখন সরিষার তেলের খুব অভাব। পান মামুদের পরামর্শমতো তাকে টাকা দিয়েছিলাম হাট থেকে একমন সরিষা কিনতে। পান মামুদ বলেছিল যে একমন সরিষাতে ১৩সের তেল দেবে। কিন্তু সে ১১সের তেল এনে হাজির। তার বক্তব্য এই যে সে ভালো সরিষা কিনতে পারেনি তাই ১১সের তেল হয়েছে। রাগারাগি করাতে সে একটা ডিম দিয়ে বলল যে, এটা কুমিরের ডিম। মাস দুয়েক আগে এক ভোরবেলায় গদাধর নদীর ধারে পায়খানা করার সময় সে দেখতে পায় যে একটা কুমির ডঙ্গায় উঠে লেজ দিয়ে মাটি সরিয়ে ডিম পেড়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল। কুমিরটা চলে যেতেই সে বাড়ি গিয়ে একটা বুড়ি এনে ডিমগুলো নিয়ে বাড়ি চলে এল। কুমিরের ডিম ইউনানি চিকিৎসায় লাগে। এটা তারই একটা ডিম। ডিমটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমাকে বোধহয় খুশি করার জন্য সার্ভেয়ার হিসাবে ডিমটা দিতে এসেছে। কুমিরটা এখনও ডিম পাড়ার জায়গাটাতে আসে। তখনই সাইকেল চড়ে তার সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখে এলাম। সেখানে কুমিরের পায়ের ছাপ ও লেজের দাগ দেখতে পেলাম। গদাধর নদীটা বেশি চওড়া নয়। কুমিরটাকে মারতে হলে নদীর ওপার হতে মারাটাই সুবিধাজনক।

পরদিন সাইকেল চড়ে বন্দুক নিয়ে গদাধর নদীর ধারে হাজির হলাম। ঝোপের আড়ালে বসে রইলাম। কুমিরের দেখা নেই। প্রায় বেলা বারোটোর সময় হঠাৎ উজানে কালো বিন্দু মতো কিছু একটা দেখলাম। ওটাতো ওখানে ছিল না। ওটা কি কোনো ডুবো গাছের ডাল? ডাঙায় একটা সরু গাছের ডালের সঙ্গে মাপ করে ওই বিন্দুটার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ মনে হল বিন্দুটা নড়ছে এবং জোয়ারের দিকে এগোচ্ছে। তাড়াতাড়ি বন্দুকে গুলি ভরে নিলাম। ওপারে রাখালগুলো আমার দিকে নজর রাখছিল। ওরা জানত যে কুমিরটা এখানে ওঠে। আমার উত্তেজনা দেখে তারা নদীর ধারে দৌড়ে এসে টেঁচাতে লাগল যে ‘কুমির এসেছে’ ‘কুমির এসেছে’। কুমিরটা লেজের ঝাপটা মেরে ডুবে গেল। আমার এত পরিশ্রম বিফলে গেল। ফিরে এলাম। পরের দিন আবার গেলাম। এবার ওভারসিয়ার ধীরেনবাবুকে সঙ্গে নিলাম। ওই রাখালগুলোকে আটকাবার জন্যে। বসে আছি। অনেকক্ষণ পর ওই বিন্দুটাকে দেখতে পেলাম। তৈরি হয়ে নিলাম। কুমিরটা আমার সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু চোখ দুটো জলের উপর। বাকি সারা শরীরটা জলের নীচে। শিকারি ভদ্রলোক বলেছিলেন যে চোখ হতে এক হাত পিছনে কুমিরের ঘাড়। শুধু সেখানে গুলি করতে। অন্য জায়গায় গুলি করলে কুমিরটা আহত হবে এবং ডুব দেবে।

পরে পূর্ব পাকিস্তান-এ অধুনা বাংলাদেশে গিয়ে মরে ভেসে উঠবে। ৪৭৫ ম্যাগনাম রাইফেল হলে ভালো হত। এক গুলিতে মরে ভূত। আমার বন্দুকে দুটো গুলি ভরা আছে। একটা বুলেট, আর একটা এল জি। কুমিরের ঘাড়টা দেখতে পাচ্ছি না। জলের নীচে আছে। সুতরাং কোনো ঝুঁকি না নিয়ে সোজা চোখ দুটো লক্ষ্য করে বুলেট দিয়ে গুলি করলাম। কুমিরটা জল তোলপাড় করে ডুব দিল। আমি জানতাম যে কোনো জলের প্রাণী ভয় পেলে শ্বোতের উলটো দিকে যাবার চেষ্টা করে। সুতরাং উজানের দিকে দৌড় লাগলাম। কুমিরটা আমার পায়ের কাছে ভেসে উঠল। আবার এল জি দিয়ে গুলি করলাম। কুমিরটা চিত হয়ে নদীর ওপার দিয়ে ভেসে যেতে লাগল।



চিতা বাঘ শিকার : বাঁদিক থেকে সমাদ্দারবাবু, লেখক, ধীরেনবাবু

গুলির শব্দ শুনে রাখাল ছেলেরা ওপারে নদীর ধারে দৌড়ে এসেছে। তারা চেষ্টাতে লাগলে ওই যে কুমিরটা ভেসে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটা রাখাল ছেলে কোথা থেকে একটা গোরু বাঁধার দড়ি নিয়ে এসে ফাঁস দিয়ে কুমিরের মুখটাকে আটকে দিল। এবার কুমিরটার জ্ঞান ফিরেছে। সে হিড়হিড় করে ছেলেটাকে জলের মধ্যে নিয়ে যেতে লাগল। আর সব ছেলেরা দড়িটাকে ধরে ফেলল। এবার টাগ অফ ওয়ার শুরু হয়ে গেল। একবার কুমিরটা ছেলেরদের জলের মধ্যে নিয়ে যায় পরক্ষণেই ছেলেরা কুমিরটাকে ডাঙর দিকে নিয়ে আসে। এই অবস্থায় ছেলেরা আমাকে এপারে এসে কুমিরটাকে গুলি করার জন্য চেষ্টাতে লাগল। কিন্তু নদী পার হব কী করে? ওরা বলল যে আরও নীচের দিকে একটা কলাগাছের ভেলা আছে। আমি ও ধীরেনবাবু সেই ভেলাতে পার হয়ে এপারে এলাম।

এদিকে এইরকম টানাটানি করতে করতে কুমিরটা নীচের দিকে ভেসে যাচ্ছে। সেই সময় ছেলেরা নদীর ধারে একটা গাছ পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছের সঙ্গে কুমিরটাকে বেঁধে ফেলল। আমি এপারে এসে দেখলাম যে কুমিরটা প্রায় ১২ ফুটের (৩ মিটার) উপর লম্বা। সবুজ রং, বোধ হয় শেওলা পড়েছে। একটা বুলেট দিয়ে গুলি করলাম। চিত হয়ে গেল। ছেলেগুলো কুমিরটাকে ডাঙ্গায় তুলে ফেলল। গোরুর গাড়িতে করে তুফানগঞ্জে নিয়ে এলাম। ছাল ছাড়িয়ে নুন ফটকিরি মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে রেখে দিলাম। পূজোর ছুটিতে কলকাতায় নিয়ে এসে কাথবার্টসন অ্যান্ড হারপারকে দিয়ে ট্যান করিয়ে সুটকেস, ওয়ালেট, জুতো করা। এটা আমার একটা রেকর্ড, এখন পর্যন্ত কেউ দড়ি দিয়ে বেঁধে কুমির মারতে পারেনি।

জোড়াই রাস্তার মাটির কাজ শেষ হয়েছে। শিঙ্গল (অমসৃণ নুড়ি) পাঠানো হচ্ছে। চূড়ান্ত বিল চেক করছি। ১২ মাইল রাস্তায় ১২ ফুট চওড়া করে ৬ ইঞ্চি পুরু শিঙ্গল-এর রাস্তা হবে। কত শিঙ্গল লাগবে তার হিসাব খুব সোজা। কিন্তু চূড়ান্ত বিলের এম বি-তে অনেক পাথর নেওয়া হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। সংকোচন ধরে নিয়েও এত পরিমাণ হওয়া উচিত নয়। ধীরেনবাবুকে বললাম যে পাথরের পরিমাণ অনেক বেশি হচ্ছে—আবার মাপটা মিলিয়ে দেখতে হবে।

আমরা দুজনে পাথরের মাপগুলো চেক করতে বেরলাম। ধীরেনবাবু পাথরের মাপ নিচ্ছেন। পরপর পাথরের থাক তবুও ১০০ ফুট হিসাবে মাপ নিতে হবে এবং এম বি-তে লিখতে হবে। একবারে ২০০ বা ৩০০ ফুট লিখলে চলবে না কারণ ফিতেটা ১০০ ফুট লম্বা। আমি চেন দিয়ে মাইল পোস্ট চেক করছি। সিমেন্ট কংক্রিটের মাইল পোস্ট তখনও আসেনি। জঙ্গলের কাঠ কেটে মাইল পোস্ট বানানো হয়েছে। দেখলাম যে মাইল পোস্টটা মাপে প্রায় ২০০ ফুট কমে বসানো হয়েছে। এবার জিনিসটা পরিষ্কার হল। ওভারসিয়ারবাবু প্রথম দিন এক বা দুই মাইলের পাথরের মাপ নিয়েছিলেন। সে মাপটা ঠিক ছিল। পরে আবার যখন পরের মাইলগুলোতে সাপ্লাই শেষ হল, ওভারসিয়ারবাবুর মাপ নেবার আগে ওই মাইল পোস্টটাকে ২০০ ফুট মতো পিছিয়ে নিয়ে এসে ঠিকমতো বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার মাপে ওই ২০০ ফুট আবার মাপ হয়ে গেল। এইভাবে প্রত্যেক রানিং বিল-এ বেশি বেশি পেমেন্ট হতে লাগল। আবার নতুন করে মাইল পোস্ট বসিয়ে সমস্ত পাথরগুলোকে ফের মাপা হল। এম বি-তে কাটাকুটি চলে না।

ইতিমধ্যে আমার ভুলোটাকে বাঘে নিয়ে গেল। রাতে ঘুমোচ্ছি। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের ক্যাম্পের দরজাগুলো বন্ধ করা যায় না। শালকাঠের দরজার পাল্লা। বর্ষাকালে বড়ো হয়ে গিয়েছে। সুতরাং দরজা দিনরাত খোলাই থাকে। ওখানে চোর বদমাইশ নেই। শুধু চিতা বাঘ ছাড়া। আমি দরজাতে একটা তাঁবুর চিক অর্থাৎ বাঁশের কাঠি দিয়ে পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। যাতে একটু আক্র হয়। ভুলোর জন্য বন্দুকটা বিছানার পাশে দাঁড় করানো থাকে। দুটো গুলি বালিশের তলায় আর একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ বালিশের পাশে রাখা থাকে। ভুলো আমার খাটের নীচে ঘুমোয়।

একদিন মাঝরাতে ভুলোর চিংকারে ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘর হতে ওভারসিয়ারবাবুরা চিংকার করছেন ‘ভুলো চুপ কর’, ‘চুপ কর’। হঠাৎ ভুলো চিক সরিয়ে বাহিরে বেরিয়ে গেল আর তারপরই ভুলোর আর্তনাদ। তারপর সব চুপচাপ। আমি বন্দুক আর টর্চ লাইটটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। ওভারসিয়ারবাবুরা চলে এসেছেন। বাহিরে একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। দরজার কাছে সিঁড়ি ধাপে বাঘের ভিজে পায়ের ছাপ।

আমাদের শব্দে বাঘটা দরজার কাছ হতে পিছিয়ে যাওয়া মাত্র ভুলো ভেবেছিল যে তার ভয়ে বাঘটা পালিয়ে যাচ্ছে। সে বাঘটাকে তাড়া করতে বেরিয়েছিল ফলে তাকে বাঘের হাতে প্রাণ দিতে হল। রাত্রে খুব খোঁজখুঁজি করলাম। পরেরদিন সকালে মহকুমা শাসকের হাতি নিয়ে এসে পাশের বাঁশঝাড় তোলপাড় করে খুঁজলাম। ভুলোর কোনো চিহ্ন পেলাম না। ভুলো আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি ‘জেহাদ’ ঘোষণা করলাম। সকলকে বলে দিলাম যে কারোর কুকুর বা ছাগল বাঘে নিয়ে গেলে আমাকে যেন খবর দেয়।

কিছুদিনের মধ্যে খবর পেলাম যে তুফানগঞ্জ শহরে এক ভদ্রলোকের কুকুর বাঘে নিয়ে গেছে। কুকুরটা বেশ বড়োসড়ো। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম। পাশের বাঁশঝাড়ে

কুকুরটার আধখাওয়া দেহটা দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের লোকদের বললাম যে কুকুরটাকে একটা গাছের সঙ্গে ভালোভাবে বেঁধে রাখতে, যাতে বাঘে আবার নিয়ে না যেতে পারে, আর একটা মাচা বাঁধতে।

সন্ধ্যার সময় খাওয়া-দাওয়া করে মাচায় পৌঁছতে রাত ৮টা বেজে গেল। গিয়ে দেখতে পেলাম যে বাঘটা কুকুরটাকে খেতে শুরু করেছে। আমাদের আসতে দেখে সরে গিয়েছে। মুঘলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা ও বর্ষাতির মধ্যে দিয়ে জল ঢুকে জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমি ও ধীরেনবাবু মাচায় গিয়ে বসলাম। অঝোরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। বাঘের দেখা নেই।

বাঘ সাধারণত শিকারের কাছে সন্ধ্যা বেলায় আর মাঝরাতে আসে। সুতরাং মাঝরাতে আসে সে আসবে না। বন্দুকটা ভাঁজ করতে গিয়ে দেখলাম সেটা ‘জ্যাম’ হয়ে গেছে। গুলি দুটো জলে ভিজে ফুলে গিয়ে ‘জ্যাম’ করে দিয়েছে। তখনকার দিনে প্লাস্টিক ছিল না। বর্ষাতি চাপা দেওয়া সত্ত্বেও বন্দুকটা ভিজে যেতে লাগল। দুই একটা জোঁকে কামড়াচ্ছে। টেনে জোঁকগুলোকে ফেলে দিচ্ছি। রক্তে জামাকাপড় কতটা ভিজে যাচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছি না। এমন সময় হাড় চিবানোর শব্দ পেলাম। বুঝলাম যে বাঘটা এসেছে। তাড়াছড়ো করলাম না। বাঘটাকে খেতে দিতে সময় দিলাম যাতে বাঘটার সাহস বাড়ে। বন্দুকে এল জি ভরা আছে। তারপর ধীরেনবাবু টর্চ জ্বালাতে বাঘটাকে দেখতে পেলাম এবং গলায় গুলি করলাম। বাঘটা একটা আওয়াজ করে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল। সাধারণত আহত হলে বাঘ কোনো আওয়াজ করে না। মৃত্যুর মতো চরম আঘাত পেলেই একটা আর্তনাদ করে। গুলি খাওয়া বাঘ। রাত্রে নীচে নামলাম না। বসে আছি, এমন সময় আবার হাড় চিবানোর শব্দ। কে আবার খেতে এসেছে? বাঘের জোড়াটা নাকি? বাঘটা মরে পড়ে আছে আর তার জোড়াটা কিল-এ খেতে এসেছে। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। বাতি জ্বালাতে দেখলাম যে কালো মতো কী একটা জন্তু। গুলি করলাম জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

সকালে মাচা থেকে নেমে দেখি জঙ্গলের মধ্যে সেই কালোমতো একটা জন্তু পড়ে। বাঘের দেখা নেই। লোকজন নিয়ে এসে জঙ্গলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। বাঘটা পেলাম না। গুলিটা ভিজে গিয়েছিল তাই বাঘটা মৃত্যুরমতো আহত হয়নি অথবা বাঘটার ভাইটাল জায়গায় গুলি লাগেনি। সারারাত জাগাটা বৃথায় গেল।

আবার খবর পেলাম। এবার এটা ২/৩ মাইল দূরে। বাঘে একটা ছাগল মেরেছে। লোক পাঠালাম ছাগলটা বেঁধে রাখতে আর একটা মাচা বাঁধতে। অফিসের পর আমি ও ধীরেনবাবু ও সাবডিভিসন ক্লার্ক সমাজদারবাবু সেই জায়গায় গিয়ে মাচায় উঠে বসলাম। সঙ্গে বন্দুক, জল আর মুড়ি। মাচাটা বড়ো নীচু করে বেঁধেছে। বাঘ নীচে থেকে নাগাল পাবে আর মাচাটা কিল-এর খুব কাছে।

বাঘটাকে আমাদের মুখোমুখি বসে ছাগলটাকে খেতে হবে। কিছু করার নেই। সন্ধ্যা হচ্ছে। পাখিরা বাসায় ফিরে এসেছে। তাদের কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে রাত হল। পাখির কিচিরমিচির শব্দ থেমে গেল। চারিদিক-নিস্তরক নিব্বুম। খানিকক্ষণ পর হাড় চিবানোর শব্দ পেলাম। ধীরেসুস্থে টর্চটা জ্বালান হল। কিছুই নেই। কিন্তু ছাগলটার বেশ



ভেঙে পড়া সানবোলা সেতু

খানিকটা খাওয়া। টর্চ নিভিয়ে বসে আছি। আবার হাড় চিবানোর শব্দ। টর্চ জ্বালাতে কিছুই নেই। আবার টর্চ নিভানো হল। আবার শব্দ। টর্চ জ্বালাতে কিছু নেই। কিন্তু এদিকে ছাগলটা ছোটো হয়ে আসছে। বাঘে খেয়ে প্রায় শেষ করে ফেলল। কিছু বুঝতে পারছি না। তখন মনে হল যে বাঘটা আমাদের মাচার নীচে বসে নেই তো। আমরা সামনের দিকে টর্চ ফেলছি, আর বাঘটা আমাদের মাচার নীচে বসে মাথাটা বাড়িয়ে ছাগলটাকে খাচ্ছে। এবার হাড় চিবানোর শব্দ হতেই মাচার নীচে টর্চ জ্বালালাম, আর বাঘটাকে দেখতে পেলাম। একটা এল জি-তে বাঘটা শেষ।

বর্ষাকাল। বন্যায় অসম অ্যাকসেস রোডের কিছু কিছু জায়গা ডুবে গিয়েছে। কালজানির ছাপানো জলে সানবালা সেতু ভেঙে গেল। এটা একটা খোলা ভিত্তির ছোটো সেতু। একটা সাময়িক বিকল্প পথ করে রাস্তা চালু রাখা হল। বর্ষার সময় আমাদের কাজ ছিল যেখানে রাস্তা ডুবে রয়েছে সেখানে গাছের গায়ে সর্বোচ্চ জলরেখার দাগ দেওয়া এবং অফিসে এসে রাস্তার কত পথ কতখানি ডুবে গিয়েছিল এবং কতখানি রাস্তার উপর জল হয়েছিল তা মার্ক করা। পরে হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠান। বর্ষার সময় আর একটা কাজ ছিল গ্যাং মজদুর দিয়ে কাঠের ব্রিজের তলা থেকে কচুরিপানা সরানো। বক্সিরহাট-জোড়াই রাস্তায় অনেক কাঠের পুল। বর্ষার শেষে এই সেতুগুলোতে শব্দ করে মাপ নিয়ে ক্ষয়ের পরিমাণ মাপা হত। একবার ক্ষয়ের পরিমাণ মাপতে গিয়ে দেখতে পেলাম যে একটা কাঠের পুলের নীচে খুব বড়ো বড়ো বোয়াল মাছ খেলা করছে। একটা বড়ো মাছ দেখে গুলি করলাম। কিছুই হল না। মাছগুলো খেলা করতে লাগল। শিকারি ভদ্রলোককে বলতে তিনি বললেন যে প্রতिसরণের ভুল হয়েছে। একে জলের মধ্যে নিশানা ঠিক হয় না তাছাড়া জলের মধ্যে গুলি কোন দিকে যাবে তার ঠিক নেই। এসব ক্ষেত্রে হারপুন বা বর্শা দিয়ে মাছ মারতে হয়।

সানবোলাতে বক্স কালভার্টের কাজ শুরু হয়ে গেল। ব্রিজ তদারকির নামে খুব ভোরে বেরিয়ে যেতাম, দু-একটা বন-মুরগি পেলে মারতাম। যাকে বলে রথ দেখা আর কলা বেচা। বন-মুরগির মাংস খেতে ভালো না, খুব ছিবড়ে। একদিন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এদিকে বোধহয় কোনো মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। হঠাৎ দেখলাম দূরে একটা বাচ্চা খরগোশ খেলা করছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। ওই খরগোশটা বোধহয় কোনো মানুষ দেখেনি। আমি নড়ছি না দেখে খরগোশটা খেলতে খেলতে আমার কাছে এসে আমার জুতো শুকতে লাগল। তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে একটু পিছিয়ে গেল। তারপর খেলতে খেলতে দূরে চলে গেল। ওই খরগোশটা বুঝতে পারল না যে সে পৃথিবীর একটা ভয়ংকর জীবের মুখোমুখি হয়েছিল।

রায়ডাক ব্রিজের কাজ প্রায় শেষ। সানবোলাতে বক্স কালভার্টের কাজও শেষ। বন্যায় ভাঙা রাস্তার মেরামতির কাজ চলেছে। এদিকে অনেক বাঘের খবর এসেছে।

দিলীপ গুপ্ত ছিলেন তুফানগঞ্জের মহকুমা শাসক। অমায়িক ভদ্রলোক। এক রবিবারে হাতিটাকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। পূর্ত দপ্তরেরও একটা হাতি ছিল, তবে সেটা থাকত গয়েরকটা সাবডিভিশনে। নাম তার ভানুমতী বা ওইরকম



মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবের নাটকাভিনয়ের কুশীলব

কিছু। সেই সময় সহকারী বাস্তুকারদের ইন্সপেকশনের কোনো গাড়ি ছিল না। আর জঙ্গলে নদীনালাতে গাড়ি চলবে কী করে? হাতিই ভরসা। হাতিটার হিসাব রাখা হত টুলস অ্যান্ড প্ল্যান্ট অ্যাকাউন্টে। পূর্ত বিভাগে পশুর কোনো ব্যাপার ছিল না। হাতিটার দানাপানির খরচ আসত আর সিটি পি-টুলস অ্যান্ড প্ল্যান্টের মেরামতি বাবদ খরচ থেকে। এক বুনো হাতির প্রেমে পড়ে ভানুমতীর বাচ্চা হল। কোন্ অ্যাকাউন্ট হেডে বাচ্চাটাকে কীভাবে হিসাবপত্রে আনা যাবে? বিভাগীয় লরি বা রোলারের কোনো বাচ্চা হয় না। শুনেছি এ ব্যাপারে মহাগানরিকের মতামত নেওয়া হয়েছিল। অনিল ঘোষ মহাশয় যিনি গয়েরকাটার সহকারী বাস্তুকার ছিলেন এবং পরে আবাসন আধিকারের মুখ্য বাস্তুকার হয়ে অবসর নেন, তিনি হাতিটাকে খুব ভালবাসতেন। হাতিটা যখন মারা যায় তখন স্টেটসম্যান কাগজে ঘোষসাহেব হাতিটার সম্বন্ধে শোক বার্তা লিখেছিলেন।

ফিরে আসা যাক, আমাদের হাতিটার কথায়। ঠিক দশটার সময় হাতি এসে হাজির। আমি আর ওভারসিয়ার ধীরেনবাবু হাতিতে চড়ে কী একটা গ্রামের দিকে চললাম। সেখান থেকে খবর এসেছিল যে একটা বাঘ বড়ো উপদ্রব করছে। পথে একটা লোককে গ্রামটা কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে—সে দূরে একটা গ্রাম দেখিয়ে দিল; তারপর বলল যে আপনারা বাঘ মারতে যাচ্ছেন? কিন্তু বাঘটাকে মারতে পারবেন না, কারণ ওটা দেওতার বাঘ-অর্থাৎ দেবতার বাঘ। গ্রামের কাছে ছোটো একটা জঙ্গল। চারিদিকে ধানের খেত। বাঘটা ওই জঙ্গলে থাকে।

জঙ্গলে ঢুকলাম। বড়ো বড়ো গাছ আর নীচে ঝোপ আর ঘাস। হাতি দিয়ে ঝোপঝাড়গুলোকে দলাইমলাই করে দিলাম। বাঘের দেখা নেই। কিন্তু বাঘটা। যে আছে তা হাতির আচরণ দেখে বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝে শুঁড় তুলে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করছে। সব জঙ্গলকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি—তবুও বাঘের দেখা নেই। বেলা চারটে বাজে। খুব খিদে পেয়েছে। মাছতকে ফিরে যেতে বললাম। বন্দুকের গুলিদুটোকে বার করে, বন্দুক ভাঁজ করে ব্যাগে ঢোকালাম মাছত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ধীরেসুস্থে ফিরে চলেছে। আর তখনই দেখলাম যে—যেন মাটি ফুঁড়ে বাঘটা বেরিয়ে এল। বেশ বড়ো আকারের। হাতির আগে আগে চলছে, আর মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখছে। আমার মনে হল যে আমাদের দেখে ও হাসছে। মাছত চিংকার করছে—গুলি করুন, গুলি করুন। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে বন্দুক বার করে গুলি ভরতে ভরতে বাঘটা উধাও, আবার খোঁজাখুঁজি। জঙ্গল তোলপাড় করে ফেললাম, পেলাম না। সন্ধে হয়ে এল। আমরা ফিরে এলাম। আর কোনোদিন ওই দেবতার বাঘটার কাছে যাইনি।

একবার এই হাতিটা একটা কাণ্ড করেছিল—এবারে সেটা বলি। হাতিটা একটা পাকা চোর। একদিন হাতিটাকে নিয়ে রায়ডাক নদী পার হয়ে কোথাও গিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। ৮টা বাজে। জোৎস্না রাত। ফিরে চলেছি। খুব ক্লান্ত থাকায় হাতির পিঠে ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ হাতিটা থেমে গেল। ঘুম ভেঙে দেখি হাতিটা খুব আস্তে আস্তে রাস্তার পাশে একটা বেড়ার কাছে যাচ্ছে। দূরে একটা কুঁড়ে ঘর। হাতি তার একটা পা তুলে কোমর সমান উঁচু বেড়াটা পেরিয়ে আস্তে আস্তে পা-টা নামাল। তারপর আর একটা পা তুলে বেড়া পার হয়ে একটা কলাগাছের ঝোপের কাছে গেল। কলাগাছে একটা বড়ো কাঁদি। এবার বুঝলাম যে হাতিটা কলা চুরি করছে। সেইজন্য সে কোনো শব্দ করছে না। হাতিটা জানে যে পরের জিনিস চুরি করতে নেই। সেইজন্য সে এত সাবধানী। কলাগাছটাকে শুঁড়ে জড়িয়ে যখন টানছে তখন একটা আওয়াজ হতেই থেমে যাচ্ছে। আবার টানছে। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে টানাটানি করে গাছটাকে উপড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে পিছন ফিরে বেড়াটা পার হল। তারপর কী দৌড়, কী দৌড়। যেন একটা বাচ্চা ছেলে পেয়ারা চুরি করে পালাচ্ছে। হাতিটা জানে যে য পলায়তি স জীবতি কিংবা চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা যদি না পড় ধরা। যখন হাতিটা কলা চুরি করছিল তখন আমি ভাবছিলাম যে লোকটা মানে যার কলাগাছ সে যদি জেগে উঠে আমাকে বলে যে হাতিটা কলা চুরি করছে—আর আপনি হাতির পিঠে বসে তাই দেখছেন? কী উত্তর দেব? বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। পকেটে একটা টাকাও নেই যে কলার দাম দিয়ে দেব।

ব্রিজগুলোর কাজ শেষ। তখনকার দিনে ধুমধাম করে কোনো ভি আই পি ডেকে তাকে দিয়ে সেতু উদ্বোধন করানো হত না বা তেমন কোনো রেওয়াজ ছিল না। সুতরাং সেতুগুলো আমিই উদ্বোধন করে দিলাম। আমার ইন্সপেকশনের গাড়ি ছিল না। সাইকেল চড়ে আমি তিনটি বড়ো মাপের সেতু উদ্বোধন করে গাড়ি চলাচলের জন্য ব্যবস্থা করে দিলাম। অফিসে সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত হিসাবপত্র শেষ করা হয়েছে। কাজ শেষের পর ড্রয়িংগুলোও শেষ করেছি। ব্রিজ বিষয়ের ফাইলগুলোও গুটিয়ে ফেলছি। ফাইলগুলো লেখা হয় ১নং, ২নং ক্রম অনুযায়ী। ১নং ২নং ক্রমগুলো ফাইলের নীচের দিকে চলে যায়। নোটশিটগুলোও তাই। এবার উলটো করে সাজাতে হবে। যেমন বই-এর পাতায় এক পৃষ্ঠা, দুই পৃষ্ঠা পর পর থাকে। এর মধ্যে বদলির আদেশনামা এসে গেছে। আমাকে যেতে হবে কোচবিহার সড়ক নির্মাণ ১নং উপভুক্তিতে, শ্রী ডি এম সেনের জায়গায়।

অনেকদিন ধরে খবর আসছিল যে একটা বাঘ বড়ো উৎপাত করছে। এক রবিবারে শ্রীগুপ্তকে বলে হাতিটাকে আনালাম। আমি, ওভারসিয়ার ধীরেনবাবু ও চিত্তবাবু, উপভুক্তির করণিক সমাজদারবাবু এবং আরও কয়েকজন, বলতে গেলে গোটা উপভুক্তিটাই হাতির পিঠে উঠিয়ে নিয়ে শিকার করতে একটা গ্রামের দিকে চললাম। সেখানে আবার পুন্ডিগাছের জঙ্গল আর মাঝে মাঝে বাঁশ ঝাড়। বাঘের উৎপাতে লোকগুলোকে গোরু-ছাগলের সঙ্গে গোয়ালঘরে শুতে হয়। এই পুন্ডি জঙ্গলের মধ্যে বাঘটাকে কোথায় খুঁজব? জঙ্গলের মাঝামাঝি হাতি দিয়ে পুন্ডি জঙ্গল মাড়িয়ে একটা রাস্তা বার করলাম। অনেক

লোক জমেছিল। লোকগুলোকে জঙ্গলের একপাশ থেকে ‘খেদা’ করতে বললাম। বাঘটা বিদ্যুতের মতো ওই রাস্তার একপাশ থেকে আর একপাশে চলে গেল। গুলি করার সময়ও পেলাম না। আবার ওদিক থেকে তাড়া। বাঘটা আগের মতো মুহূর্তের মধ্যে ওধারে চলে গেল এবং না থেমে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কাছে বাঁশঝাড়ুে ঢুকে পড়ল। সেখানে ঝোপের মধ্য থেকে যেই আমাদের দেখতে মাথা তুলেছে অমনি আমি এল-জি দিয়ে গুলি করলাম। বাঘটা অনেক দূরে ছিল। বোধহয় তার পাঁজরে গুলি লেগেছে—কারণ খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ে সে কাছেই গদাধর নদীর দিকে যাচ্ছে। হাতিটাকে বাঘের পিছনে যেতে বললাম। মাছত রাজি হল না। সে বলল যে বাঘের গায়ে গুলি লেগেছে। বাঘটা হাতির পিঠে উঠে আসতে পারে। ওই সময় ধীরেনবাবু আমার বন্দুকটা নিয়ে বাঘটার পিছনে যেতে চাইলেন। হাতি থেকে নেমে ধীরেনবাবু আন্দাজে বাঘের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। কারণ পুন্ডি গাছের জঙ্গলের জন্য ধীরেনবাবু কিছুই দেখতে পারছেন না। এদিকে মাঠের মধ্যে অনেক লোক জমেছে। কেউ কেউ গাছে চড়ে বাঘ মারা দেখছে। বাঘটা একটা গাছের নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় গাছের ডালে বসা কিছু লোক ‘বাঘ’ ‘বাঘ’ বলে চৈঁচিয়ে উঠল আর বাঘটা তড়াঙ্ করে গাছের ডালে উঠে পড়ল। লোকগুলো টপ্ টপ্ করে গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে নামছে। বাঘটা গাছে লোক না পেয়ে নীচের লোকদের পিঠে লাফিয়ে পড়ে, একজনকে নখের আঁচড়ে জখম করে আর একজনের পিঠের উপর পড়ছে। এইভাবে চারজনকে জখম করে বাঘটা গদাধর নদীর দিকে চলে গেল। সেখানে নদীর খাড়া পাড়। বাঘটা লাফ দিয়ে নীচে নেমে পালিয়ে গেল।

পুন্ডি গাছের জঙ্গল থেকে ধীরেনবাবু বেরিয়ে এসে ‘কোথায় বাঘ’ ‘কোথায় বাঘ’ বলে বাঘ খুঁজতে লাগলেন। লোকগুলো সেই নদীর ধারটা দেখিয়ে দিল। ধীরেনবাবু দৌড়ে সেই জায়গায় গেলেন আর নদীর ওপারের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যে বাঘটা সাঁতরে ওপারে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। মাছতও হাতিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবার হাতির পিঠ থেকে দেখতে পেলাম যে বাঘটা জলের ধারে শুয়ে আছে আর ধীরেনবাবু ঠিক বাঘটার উপরে পাড়ে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বাঘ খুঁজছেন। আমরা ও মাছত মিলে সকলে ‘বাঘ’ ‘বাঘ’ বলে চৈঁচিয়ে ধীরেনবাবুকে সাবধান করতে লাগলাম—কিন্তু ধীরেনবাবু তা শুনতে পেলেন না।

বাঘটা মাথা তুলল। তারপর লাফিয়ে একেবারে ধীরেনবাবুর পায়ের কাছে। এবার ধীরেনবাবু হঠাৎ পায়ের কাছে বাঘটাকে দেখতে পেয়ে গুলি করার কথা ভুলে গিয়ে সোজা বন্দুক দিয়ে বাঘের মাথায় এক বাড়ি। দুটো গুলি মিসফায়ার হয়ে গেল। আর কবজা থেকে বন্দুকটাও ভেঙে দুটুকরো। গুলির শব্দে বাঘটা হকচকিয়ে গিয়েছে। সেই ফাঁকে ধীরেনবাবু বন্দুকের বাঁটটাকে বাগিয়ে ধরে আবার মারলেন বাঘটার মাথায়। বাঘটা অবশ্য থাবা চালিয়ে ধীরেনবাবুর মার আটকাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পারল না। ধীরেনবাবু তখন ‘বালিশ’ পেটানো শুরু করলেন। লোকজন ছুটে এসেছে। আমিও হাতি থেকে নেমে ধীরেনবাবুর হাত থেকে বাঘের চামড়াটা বাঁচালাম, বাঘটাকে হাতির পিঠে ওঠালাম। জখম লোকগুলোকে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে তুফানগঞ্জে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভরতি করে দিলাম। ডাক্তারবাবু আমার জানাশোনা চিকিৎসা শুরু করলেন। বিকালে এসে বললেন যে পেনিসিলিন দরকার, হাসপাতালে মজুত নেই। ৮০ টাকা দিয়ে পেনিসিলিন কিনে দিলাম। ৫/৬ দিনের মধ্যে লোকগুলো ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেল।



বিধবস্ত হাঁসখাওয়া সেতু

কোচবিহারে বদলি হয়ে এলাম। এটা মহারাজার রাজধানী শহর ছিল। এখানে এসে আমার জীবনযাত্রাটাই পালটে গেল। বিজলি ভবনে থাকি। মাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছি। অফিসের পর ক্লাবে যাই। বাস্তুকারেরা সবাই মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাবে মহারাজার আমলে রাজা-মহারাজারা, সাহেব মেমরা আসতেন। বড়ো বলরুম, লাউঞ্জ, টেবল টেনিস রুম, তাস খেলার ঘর, বিলিয়ার্ড ঘর। এমনকী ধূমপানের পৃথক ঘর। তাছাড়া ছিল নিঃশব্দ মদ্যপানের বার। পরে অবশ্য বারটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাইরে ছিল টেনিস কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, আর সুন্দর ফুলের বাগান।

ক্লাবে এসে বিলিয়ার্ডে হাত পাকাতাম আর. একটু আধটু টেনিস খেলতে চেষ্টা করতাম। নির্মাণ পর্যদের সহকারী বাস্তুকার শ্রীঅমূল্য মুখার্জি ভালো টেনিস খেলত। অমূল্য চাকরি ছেড়ে মাসকটে চলে যায়। সেখানে সে সুলতানের প্রিয়পাত্র হয়েছিল। সে ছিল সুলতানের প্রযুক্তি উপদেষ্টা। তার স্ত্রী সুলতানের বেগমদের ইংরেজি শেখাতেন। ওনাকে প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য একটা হেলিকপ্টার মজুত থাকত।

আমাদের নিবাহী বাস্তুকার ছিলেন শ্রীআর পি চন্দ। চন্দ সাহেবের আর ডেপুটি কমিশনার শ্রীপি সি মজুমদার (আই এ এস) সাহেবের ছিল খুব থিয়েটার-প্রীতি। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবের সদস্যরাই ছিল নাটকের কুশীলব। বসের

ছকুমে আমাদের থিয়েটার করতে হত। অমিয়দা (শ্রীঅমিয় মুখার্জি, পূর্ত বিভাগের সহকারী বাস্তুকার ছিলেন) ভাল ‘পার্ট’ করতেন। নায়িকা হতেন রমেশ বৌদি অর্থাৎ পূর্ত বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার শ্রীরমেশচন্দ্র বোসের স্ত্রী। আমরা সব নন্দী-ভূঙ্গীর দল। আমি আবার একটু লাজুক প্রকৃতির ছিলাম। স্টেজে উঠলেই গলা শুকিয়ে যেত।

এবার কাজের কথায় আসি। বন্যার জন্য সবসময় কাজ লেগেই থাকত। এ পুলটা ভাঙছে, ও রাস্তার খানিকটা বন্যার জলে ধুয়ে গিয়েছে। তার মাপজোখ করা, এস্টিমেট করা আর - ভাঙা জায়গাগুলোকে চটপট মেরামত করা। একদিন অখিলবাবু (শ্রীঅখিলচন্দ্র বিশী, আসানুল্লা পূর্ব পাকিস্তান কলেজ থেকে পাশ করা ওভারসিয়ার) মাথাভাঙা রাস্তার লং সেকশন এনে দেখলেন যে হাঁসখাওয়া নদীর তলাটা (বেড) পাশের তোরসা নদীর তলা (বেড) থেকে ১০/১২ ফুট নীচে। তাই কী হয়? দুটো নদী পাশাপাশি চলছে। তোরসার মতো একটা বড়ো নদী হাঁসখাওয়ার মতো ছোটো একটা ছড়ার (ওখানকার লোকেরা ছোটো নদীকে ‘ছড়া’ বলে) ১০/১২ ফুট উঁচু দিয়ে বয়ে যাচ্ছে! অখিলবাবুকে বললাম, নদীতল পরিমাপক যন্ত্রে কলিমেশান এরর আছে। অখিলবাবুর জবাব ছিল কলিমেশান এররের জন্য ১-২ ইঞ্চি তফাৎ হতে পারে। ১০/১২ ফুট হতে পারে না। দুজনে আলাদা আলাদা নদীতল পরিমাপক যন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নদীতল আর নদী দুটোর সাউন্ডিং নিয়ে অফিসে এসে প্লট করে দেখলাম যে অখিলবাবুর কথাই ঠিক। ১১ ফুট তফাৎ। চন্দ সাহেবকে বললাম। চন্দ সাহেবও অবাক হলেন। হাঁসখাওয়ার উজানটা দেখে আসতে বললেন। দেখলাম যে তোরসার জল বর্ষার সময় ছাপিয়ে হাঁসখাওয়াতে ঢুকছে। একটা বালির বাঁধ দিয়ে তোরসার ছাপিয়ে আসা জল আটকাবার চেষ্টা করলাম। সেই বছরে তোরসার জল স্পিল বাঁধটাকে ভেঙে ১০০ ফুট পুলটাকে ভেঙে হাঁসখাওয়া নদীকে ৩০০ ফুট চওড়া করে দিল। ওদিকে তোরসা নদীতে আমাদের অ্যালুমিনিয়াম পল্টুন বোটটা নদীর ধারে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। বন্যায় নদীর পাড় ভেঙে গাছটাকে উপড়ে দিয়ে পল্টুনটা ভেসে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে। খোঁজ, খোঁজ। খুঁজে পাওয়া গেল দুই মাইল নীচে, একটা মরা ছড়ার (মরা নদীর সোঁতা) মধ্যে আটকে আছে। পরের দিন চারজন মাঝি, মাস্টার মেকানিক, ফিটার ও রাস্তার দুজন মজুরের কাঁধে দুটো ২০ হর্সপাওয়ার আউটবোর্ড মোটর, পেট্রল ভরতি জেরিকেন ইত্যাদি নিয়ে সেই পল্টুন বোটটার কাছে পৌঁছলাম। দুটো আউট বোর্ড মোটর লাগিয়ে স্রোতের বিপরীতে আসতে লাগলাম। একটা বাঁকের মাথায় স্রোত এত বেশি যে ৪০ হর্সপাওয়ার মোটর দুটো পল্টুনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। পুরো দম নিয়ে মোটর চালিয়েও ওই বাঁকটাকে কাটিয়ে উপরে উঠতে পারলাম না। বিকেল হয়ে আসছে। ইঞ্জিন গরম হয়ে যাচ্ছে। বার বার চেষ্টা করছি। একটা ইঞ্জিন ভীষণ আওয়াজ করে হঠাৎ থেমে গেল। জল থেকে তুলে দেখা গেল যে প্রপেলারটা খুলে কোথায় পড়ে গিয়েছে। একটা ইঞ্জিন, সুতরাং আর চেষ্টা করে লাভ নেই। ভাঁটিতে নেমে কোচবিহার শহরের কাছে পল্টুনটাকে বাঁধব। ভেসে যাচ্ছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এমন সময় হঠাৎ পল্টুনটা একটা ডুবো গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একটা পাশ উঠে গেল। তারপর স্রোতের টানে আস্তে আস্তে নেমে ফের সমান হল। ওই কাত হওয়ার সময় একটা জেরিকেন গড়াতে গড়াতে জলে পড়ে গেল। এবার দেখা গেল যে ডুবো গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার সময় রাডার (হাল)-এর একটা তার গাছের ডালে আটকে গিয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। দুটো তার দিয়ে রাডারটাকে ঠিক অবস্থানে আনা হল। পল্টুনটা এখন নিজের খুশিমতো ভেসে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে ডুবো গাছে ধাক্কা খাচ্ছে, মাঝে মাঝে আপন মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। পল্টুনটার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

পল্টুনটা মাঝে মাঝে নদীর পাড়ের কাছে চলে আসছে। তখন ঠিক করলাম যে দুজন মাঝি দড়ি নিয়ে লাফিয়ে পাড়ে উঠে পল্টুনটাকে আটকে রাখবে। পল্টুনটা পাড়ের কাছে চলে এসেছে। পল্টুনের সঙ্গে বাঁধা দড়ির একপ্রান্ত ধরে দুজন মাঝি লাফিয়ে ডাঙায় উঠে পড়ল—কিন্তু তারা পল্টুনটাকে ধরে রাখতে পারল না। বরং তাদের টানতে টানতে পল্টুনটা নীচের দিকে ভেসে চলল। নদীর ধারে একটা মোটা গাছ পেয়ে, সেটার সঙ্গে মাঝিরা পল্টুনটাকে বেঁধে ফেলল। যাক নিশ্চিত। কিন্তু না। গাছটা এবার বেঁকে যেতে লাগল। তারপর গাছটাকে উপড়ে নিয়ে পল্টুনটা আপন মনে ভেসে চলল। তখন রাত হয়ে গিয়েছে। বোধহয় অমাবস্যার রাত। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কোনো আলো চোখে পড়ছে না। এত অন্ধকার যে বোটের উপরের জিনিসগুলোকে ভালো দেখতে পারছি না। এখানে নদী বেশ চওড়া—এত অন্ধকার যে পাড় বলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব সমান। এরপর কোচবিহার শহর পার হয়ে রেলের ব্রিজের তলা দিয়ে যেতে হবে। রেলের ব্রিজটা খুব সরু। যেন একটা খাত, স্রোত খুব বেশি। ব্রিজের পিলারে ধাক্কা খেলে বোটটা চুরমার হয়ে যাবে। তারপর নদীটা চলে গিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে মানে এখনকার বাংলাদেশের মধ্যে। পল্টুনটা ঘুরপাক খেতে খেতে রেলব্রিজের দিকে এগোচ্ছে।

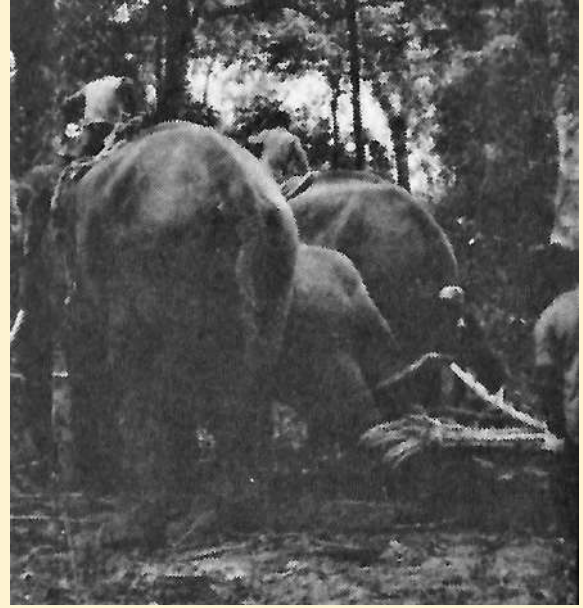
আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলাম। সকলকে ডেকে বললাম—এবার যার যার তার তার অর্থাৎ যে যেভাবে পারো নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাও। জামাকাপড় খুলে আন্ডারওয়ার পরে সকলে রেডি হলাম। নদীর পাড় যদি দেখতে পাই বা আন্দাজ করতে পারি তাহলে সকলে জলে লাফিয়ে পড়ব। সকলে সাঁতার জানি। কিন্তু জলে হাত দিয়ে দেখি কী ঠান্ডা। বরফ তো পাহাড়ের মাথায়, সে তো অনেক দূরে, এখানেও জল এত ঠান্ডা! এই জলে নামলেই জমে যাব। জলে লাফাবার ইচ্ছেটাই চলে গেল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম—রেলব্রিজের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার জন্যে।

এলোমেলোভাবে বোটটা ভেসে চলেছে। হঠাৎ খস খস আওয়াজ। পল্টুনের তলাটা এবার বালিতে লেগে গিয়েছে। আমাদের লোকেরা লাফিয়ে নেমে দেখল যে মাত্র একহাঁটু জল। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম যে দূরে একটা বাঁশঝাড়। আমরা একটা মরা ছড়ার (মরা নদীর সোঁতার) মধ্যে ঢুকে পড়েছি। যাক আমরা এবারের মতো বেঁচে গেলাম। পল্টুনটাকে

ঠেলে নিয়ে গিয়ে বাঁশঝাড়ের সঙ্গে বাঁধলাম। পাড়ে উঠে দেখি একটা কুঁড়ে ঘর। ডাকাডাকি করে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আউট বোর্ড মোটর দুটো, একটা জেরিকেন আর অন্য সব জিনিসপত্রগুলো ওই বাড়ির সামনে রেখে জামাকাপড় পরে শহরের দিকে রওনা দিলাম। চটা বেজে গিয়েছে। বুঝতে পারলাম যে আমরা মহারাজার প্রাসাদের কাছাকাছি নেমেছি। বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় রাত নটা। মাকে কিছু বললাম না।

পরের দিন অফিসে বসে রিপোর্টে লিখলাম যে হাঁসখাওয়া নদীর উপর পুলটা ভেঙে গিয়ে নদীটা প্রায় ৩০০ ফুট চওড়া হয়ে গিয়েছে। পল্টুনটা ভেসে গিয়েছিল, তাকে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তীর স্রোত থাকার জন্য মাথাভাঙা রাস্তার কাছে সেটা আনতে পারলাম না। কুচবিহার শহরের কাছে পল্টুনটাকে রেখে এসেছি। বন্যার জল কমে গেলে পল্টুনটাকে সম্বন্ধে রেখে আসব। রিপোর্ট লেখা শেষ। কোনো সৈন্য কি বলে যে যুদ্ধে তার কানের কাছ দিয়ে গুলি চলে গিয়েছিল? প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করাটাই তো ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ। তাতে হার-জিত তো থাকবে। এসব তো জীবনেরই অঙ্গ। কিছুদিনের মধ্যে ঘটনাটা ভুলে গেলাম।

চন্দসাহেব বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন সমাদ্দার সাহেব (শ্রীসুশীলকুমার সমাদ্দার-যিনি পূর্ত বিভাগের দ্বিতীয় ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ ও পরে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনে যোগ দেন) তখন রবিবারে তাঁর বাড়িতে আড্ডা বসত। এক রবিবারে জেলা বন বিভাগের আধিকারিক শ্রীমনোজ সরকারের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রাম করেছেন বঙ্গাদুয়ার থেকে গত শুক্রবারে। হাতি ধরার জন্য ‘খেদা’ অপারেশন হচ্ছে। হাতি ধরা যদি দেখতে চাও তো চলে এসো। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওনার ছোটো ছেলে শ্রীঅরুণ সরকার পূর্ত বিভাগে বিদ্যুৎ শাখায় নির্বাহী প্রযুক্তিবিদ ছিলেন—অল্প বয়সে মারা যান। যদিও টেলিগ্রামটা দুদিনের পুরানো, তবুও আমার ওয়েপন ক্যারিয়ারটা নিয়ে সুশীলদার বাড়িতে গেলাম। সেখানে অনেকে এসেছেন। হাতি ধরার কথা বলতেই সকলে গাড়িতে উঠে বসলেন। ওঁদের মধ্যে দুজন মহিলা। বঙ্গাদুয়ারে গিয়ে খুঁজে খুঁজে ভূটান সীমান্তের কাছে ‘খেদা’-র সন্ধান পেলাম। হাতিগুলোকে খেদার মধ্যে থেকে বার করা হয়েছে। এক একটা হাতিকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার দুপাশে দুটো পোষা হাতি পাহারা দিচ্ছে। হাতির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ফিরে আসতে আসতে বিকেল হয়ে গেল।



হাতি খেদা

একবার একটা শুয়োর মেরেছিলাম। বঞ্জিরহাট পেরিয়ে রায়ডাক নদী পেরিয়ে আসামের মধ্যে একটা গ্রামে গেলাম। সেখানে শুয়োরের বড়ো অত্যাচার। এক বৃদ্ধা এসে আমাকে দেখাল যে কাঠ কুড়োতে জঙ্গলে গিয়ে সে একটা শুয়োরের সামনাসামনি পড়ে যায়। শুয়োরটা তার ডানপায়ের মাংস দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। ডাক্তার দেখায়নি বা টিটেনাস ইঞ্জেকশনও দেয়নি। তাছাড়া ওই জঙ্গলের মধ্যে ডাক্তার কোথায় পাবে? ঘাসপাতা দিয়ে ক্ষতস্থানটা বাঁধা আছে। সন্দের সময় ধানখেতে গেলাম। একপাল শুয়োর এসেছে। ছোটোবড়ো মিলিয়ে অনেক।

একটা বড়ো পরিবার-কটাকে মারব। একটা বড়ো শুয়োর দেখে আমি ও ধীরেনবাবু একসঙ্গে গুলি করলাম। শুয়োরটা পড়ে গেল। মোষের মতো চেহারা। নদী পার করে তাকে গাড়িতে তুলতে আমরা হিমসিম খেয়ে গেলাম। কোচবিহারে নিয়ে এলাম। ওই বীভৎস প্রাণীটাকে কে খাবে? সেনাবাহিনীর ক্যাম্প পাঠালাম। ক্যাম্পটন সাহেব ফেরত পাঠালেন এই বলে যে তাঁদের যৌথ মেস, সুতরাং শুয়োর চলবে না। শুয়োরটাকে মিউনিসিপ্যালিটির খাণ্ড-মেথরদের দিয়ে দিলাম।

প্রত্যেক বর্ষায় কাঠের পুলগুলো ভেঙে যায়। ভাঙা পুলের কাঠগুলো গুদামে জড়ো করা হয়। সেই কাঠ দিয়ে পূর্ত বিভাগের পক্ষে নিজেরাই পুলগুলোর রেলিং ইত্যাদি মেরামত করে দিতাম। এদিকে আমাদের অফিস কম্পাউন্ডে কাঠের পাহাড় হয়ে গিয়েছে। একদিন আমাদের কার্পেন্টারদের বললাম যে একটা নৌকা তৈরি করে দিতে। ১৮ ফুট লম্বা হবে কারণ লরির ডালা ১২ ফুট লম্বা। লরিতে করে নৌকাটাকে এক নদী হতে আর এক নদীতে নিয়ে যাবার সুবিধা হবে। কাঠের ফ্রেম আর পিচের ড্রামের টিন দিয়ে খোলে করা হল। সিমেন্টের বস্তা গরম পিচে ডুবিয়ে জয়েন্টগুলোতে লাগানো হল যাতে জল লিক না করে। নাম দিলাম ‘তোরসা-১৯৫৩’। কারণ তোরসা নদীতে হাঁস মারতে যাব আর ১৯৫৩ সালে নৌকাটা তৈরি হয়েছিল। নৌকাটাকে ভালো গদি লাগানো হল। চারটি লাইফ বয়া ফিট করলাম। একটা ২০ হর্স পাওয়ারের সি-হর্স-আউটবোর্ড মোটর লাগিয়ে তোরসা নদীতে হাঁস মারতে যেতাম। অবশ্য একটা হাঁসও মারতে পারিনি।

তবে সারা সকালটা বুনো হাঁস তাড়া করে ফিরেছি। আর ঠিক দশটার আগে অফিসে হাজির হয়েছি। দুপুরে বাড়ি গিয়ে স্নান খাওয়া-দাওয়া করে আবার অফিসে এবং তারপর সন্ধ্যার সময় ক্লাবে হাজিরা দেওয়া চলেছে।

অন্য ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা ইম্পেকশনে যাবার জন্য আমাদের 'তোরসা-১৯৫৩' নৌকাটা ব্যবহার করতেন। জলপথ বিভাগের মুখ্য বাস্তুরকার মিঃ মন্ডল এই নৌকাতে চড়ে ইম্পেকশনে যেতেন। সেই সময়ে ডিভিশন অফিসে অডিট পার্টি এলো। অডিট অফিসার হলেন একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। একদিন দেখলাম সেই ভদ্রলোক একটা ২২ বোরে-এর রাইফেল নিয়ে পাখি শিকার করছেন। তিনি কোথাও অডিট করতে গেলে রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে যান, উদ্দেশ্য যদি কোনো পাখি মারা যায়। তাঁকে আমার বোটে চাপিয়ে তোরসায় হাঁস মারতে নিয়ে গেলাম। কোনো হাঁস মারতে পারলাম না। অনেক দূর দিয়ে হাঁসগুলো উড়ে পালিয়ে গেল। সম্ভবত সেই কারণে ভদ্রলোক এক অডিট অবজেকশন দিয়ে গেলেন যে পূর্ত সড়ক বিভাগের অফিসে একটা বোট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তাদের টুলস অ্যান্ড প্ল্যান্টে তার কোনো হিসাব নেই।

ইতিমধ্যে শিকার করা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ এরা সব সংরক্ষিত প্রাণী। এদের শিকার করা বারণ। কিন্তু ঘটনাচক্রে একটা বাঘ মরে গিয়ে পূর্ত বিভাগের লোকদের একবার কী বিপদেই ফেলেছিল সেই কথাটা বলি। এটা অনেকদিন পরের ঘটনা। আমি তখন নর্দার্ন সার্কেলের অধীক্ষক বাস্তুরকার। একদিন খবর পেলাম যে বন দপ্তরের লোকেরা আমাদের মেকানিক আর ফিটারদের আটকে রেখেছে। খবর নিয়ে জানলাম যে আমাদের শঙ্কর মেকানিক ফিটার এবং কয়েকজন লোক নিয়ে লরিতে চেপে নাগরাকাটায় গিয়েছিল একটা বিভাগীয় রোলার সারাতে। কাজ শেষ করতে বেশ রাত হয়ে যায়। রাত নটার সময়ে লরিতে করেই ফিরছিল। লাটাগুড়ির জঙ্গলে এমনিতে গাড়ি চলাচল কম তার উপর রাতের দিকে সাধারণত কোনো গাড়িই চলে না। তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, তাই শঙ্কর গাড়ি চালাচ্ছিল প্রচণ্ড গতিতে। হঠাৎ কী একটা হলদে মতো গাড়ির সামনে এসে পড়ল। তার ধাক্কায় গাড়ির হেডলাইট দুটো ভেঙে চুরমার। গাড়ি থামিয়ে টর্চের আলোতে দেখতে পেল যে একটা বাঘ রাস্তায় পড়ে মরে আছে। যে সে বাঘ নয়, আস্ত একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার-এখন বিশেষ সংরক্ষিত প্রাণী। বাঘটাকে লরিতে তুলে লাটাগুড়ি বন দপ্তরে বাঘটাকে জমা দিতে গিয়েই বাধল যত গণ্ডগোল—ওই



মৃত শয়োরের দেহ লরিতে তোলা হয়েছে

দপ্তরের লোকেরা বলল যে তোমরা বাঘটাকে গুলি করে মেরেছ—চোখে গুলির দাগ আছে। আমাদের লোকদের আটকে রাখল। আমাদের লোকেরা যতই তাদের বোঝাবার চেষ্টা করে যে চোখের গুলির দাগটা অনেক পুরানো। বাঘটা কানা হয়ে গিয়েছে। ভালো করে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ লরির সামনে এসে লরি চাপা পড়েছে। তাদের দোষ কোথায়? ফরেন্সের লোকদের বক্তব্য যে লরি চাপা পড়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মারা পড়েছে এমন কথা ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই। এমনকী করবেট সাহেবও (জিম করবেট, একজন বিখ্যাত শিকারী, তাঁর নামে কুমায়ুনে গড়া হয়েছে করবেট ন্যাশনাল পার্ক) এমন ঘটনার কথা কোথাও লিখে যাননি। জেলা বন আধিকারিক সাহেবকে বলে আমাদের লোকদের ছাড়িয়ে আনা হল আর বাঘটাকে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হল।

উত্তর বাংলায় অনেকদিন হয়ে গেল। বড়ো কোনো প্রকল্প নেই। শুধু রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, রাস্তাঘাট মেরামত করি। বর্ষার সময় কিছু কিছু রাস্তা আর কাঠের পুল ভেঙে যায়। সেগুলোকে আবার মেরামত করে চালু করা। ভাঙগড়াই তো উত্তরবঙ্গের রাস্তার ইতিহাস। কোচবিহার শহরে বিজলি ভবনে আমি আর মা থাকি। মা রোজ মদনমোহন মন্দিরে যান আর আমি যাই মহারাজা ক্লাবে। থিয়েটারের দলটা উঠে গিয়েছে। ক্লাবও টিমটিম করে চলছে। সেকালের সেই জৌলুস আর নেই। জীবন হয়ে উঠেছে একঘেয়ে। বাজেট মিটিং-এ ডিভিশন অফিসে যাই। তখন মফস্সলের সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হয়। আমার ও সমাদ্দার সাহেবের বাংলাতে তাদের উঠতে হয়। শিবু (শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, যিনি পরে সল্টলেক স্টেডিয়ামের ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন) ও তার স্ত্রী, বন্যার সময় ইলেকট্রিক্যালের সহকারী প্রযুক্তিবিদ শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষাল সস্ত্রীক আমার বাড়িতে উঠতেন। তাছাড়া আমাদের বিভাগের কোনো ইঞ্জিনিয়ারদের কোচবিহারে আসতে হলে আমার কাছেই উঠতে হত। কারণ সার্কিট হাউস ছাড়া ডাকবাংলোটা অন্য অফিসারদের থাকার জায়গা হয়ে গিয়েছিল। তখন কোচবিহারে থাকার জায়গার বড়ো অভাব।

কোচবিহার রাজ্যটা যখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন অনেক সংখ্যক সরকারি কর্মচারীকে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়। তাদের থাকার জন্য ১২টা ছোটো ছোটো একতলা বাড়ি তৈরি করা হয়। সেগুলি ওই কর্মচারীদের সকলের প্রাপ্য নির্ধারিত মানের বাড়ি নয়। সেখানে নির্মাণ পর্যদ, সড়ক বিভাগ, সেচ বিভাগ ও আমাদের বিদ্যুৎ শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা

থাকতেন। বিক্রয় কর আধিকারিক, আবগারি আধিকারিক ছাড়াও কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার অফিসারও থাকতেন। ওই জায়গাটার নাম হয়েছিল 'বার ভুঁইয়া' কলোনি। জায়গাটার অবস্থান কিছুটা নীচু ছিল। একটু বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমে যেত। একবার বৃষ্টিটা একটু বেশি রকম হয়েছিল ফলে ঘরের মধ্যে আধ-হাঁটু জল। সারারাত বৃষ্টিতে ওই অবস্থা। সকালে গিয়ে দেখি যে সব বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে পড়েছে। অমিয়দা বারান্দাতে জলের মধ্যে চেয়ার পেতে চেয়ারের উপর পা তুলে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছেন। ঘরের মধ্যে চোকির উপর সব জিনিসপত্র ওঠানো। আর অমিয়বৌদি টেবিলের উপর স্টোভে খিচুড়ি রান্না করছেন। অক্ষয় ঘোষালের স্ত্রী জল দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাদের বিজলি ভবনে নিয়ে এলাম। দুদিন পরেই জল নেমে যেতেই তারা তাদের কোয়ার্টারে ফিরে গেল।

কোচবিহারের জীবনটা বড়ো গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় একদিন সমাদ্দার সাহেব ডেকে বললেন যে মন্ডলসাহেব (মিঃ বি বি মন্ডল, আই এ. এস, অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার পরে পূর্ত বিভাগের সচিব হয়েছিলেন) ফোন করেছিলেন যে তাঁর একটা জিপ মাথাভাঙা ট্রেজারিতে ঢাকা নিয়ে গিয়েছিল, ফেরার পথে জিপটা তোরসা নদীর চরে আটকে গিয়েছে। হাতি পাঠিয়েও তুলতে পারছে না। তোমরা লোকজন নিয়ে গিয়ে জিপটাকে তুলে দাও। লরিতে শালবল্লা, বাঁশ, দড়ি আর একটা ক্র্যাবউইঞ্চ নিয়ে তোরসাতে পৌঁছলাম। জিপটাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিছুদূরে হাতিটা ডালপালা চিবোচ্ছে। জিপটাকে কী উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে? ঘাটের মাঝিদের জিজ্ঞাসা করতে বলল যে নদীর মধ্যে ওই যে বাঁশ পোতা আছে ওইখানে জিপটা ডুবে গিয়েছে। দেখলাম যে নদীর মাঝে একটা বাঁশ পোতা আছে। সেখানে আধ-হাঁটু পরিষ্কার জল বয়ে যাচ্ছে। কিছু দূরে চড়ায় হুডের ভাঙা অংশ পড়ে আছে। হাতি দিয়ে টানাটানির ফলে হুডের অংশবিশেষ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। বুঝলাম যে চোরাবালিতে পড়ে। জিপটা ডুবে গেছে। তাড়াতাড়ি আমাদের পন্থনটাকে ওই বাঁশ পোঁতার জায়গায় নিয়ে আসা হল। পন্থনটাতে দুটো ফ্ল্যাট বটম অ্যালুমিনিয়াম বোট একটা কাঠের কড়ি দিয়ে আটকানো। পন্থন খুব কম জলে যেতে পারে। যেখানে বাঁশটা পোঁতা আছে, তার দুপাশে অ্যালুমিনিয়াম বোটটাকে ঠিকমতো বসানো হল। দুই বোটের মাঝখানে উইঞ্চটাকে রাখা হল, ঠিক জিপটা যেখানে আছে তার উপর। এবার একটা লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে বাঁশের কাছে দাঁড়াতে বললাম। একটু নড়াচড়া করতেই সেই লোকটা ধীরে ধীরে নদীর মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল। তারপর কিছুটা তলিয়ে যেতে লোকটা চুঁচিয়ে উঠে বলল যে জিপটা পায়ে ঠেকছে। একটা লোহার হুক দিয়ে বলা হল যে পা দিয়ে হুকটাকে জিপের কোনো শক্ত জায়গায় আটকে দিতে। অনেক কসরৎ করে হুকটাকে মাডগার্ডে আটকে দিল। উইঞ্চের তারের সঙ্গে হুকটাকে বাঁধা হল, এবার লোকটাকে টেনে ওঠানো হল। তারপর ওপাশে গিয়ে আর একটা হুক ওপাশের মাডগার্ডের সঙ্গে আটকানো হল। এবার আস্ত আস্তে উইঞ্চ ঘোরানো। তাড়াতাড়ি করলে মাডগার্ড ছিঁড়ে যেতে পারে। আস্তে আস্তে জিপটা উঠে আসতে লাগল। এবার জিপটা উইঞ্চে ঠেকে গেল। উইঞ্চ খুলে নিয়ে পন্থনটা সরাতে গেলে জিপটা আবার তলিয়ে যাবে। কী করা যায়। এমন সময় মাছ তার হাতিটাকে নিয়ে এগিয়ে এল। হাতির সঙ্গে পন্থনের দড়িটা বেঁধে দেওয়া হল। দেখলাম বটে হাতিটার কী শক্তি! হাতিটা হিড়হিড় করে পন্থনের দুটো নৌকা, উইঞ্চ আর জিপটাকে টানতে টানতে একেবারে ডাঙায় উঠিয়ে দিল। কাদামাখা বিধবস্ত জিপটাকে ওখানে রেখে এসে সমাদ্দার সাহেবকে বললাম যে জিপটাকে ওঠানো হয়েছে।

খুব বৃষ্টি হলে বা বন্যার আশঙ্কা থাকলে সমাদ্দার সাহেব আমাদের নিয়ে রাস্তা পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়তেন। এক রবিবারে বর্ষার দিনে আমাকে ও অক্ষয় ঘোষালকে নিয়ে আসাম অ্যাকসেস রোড (৩১নং জাতীয় সড়ক) ধরে চলতে লাগলাম। একে জায়গায় দেখলাম যে জলের স্তর রাস্তার সমান হয়ে গিয়েছে। ফেরার সময় দেখি যে রাস্তার উপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। এভাবে জল গেলে রাস্তার ফ্ল্যাক ধুয়ে যাবে এবং তারপর রাস্তাটা ভেঙে যাবে। এইরকম পরিস্থিতির জন্য ২/৩ মাইল অন্তর অন্তর বোল্ডারের স্তূপ করা থাকে। সমাদ্দার সাহেব আমাদের নিয়ে একটা বোল্ডারের স্তূপের কাছে গিয়ে ল্যান্ড রোভারটাকে দাঁড় করালেন। আমরা সকলে ল্যান্ডরোভারে বোল্ডার বোঝাই করতে লাগলাম। গ্যাং মজদুর কোথায় পাব? আর তারা কে কোথায় থাকে তাও জানি না। তার উপর রবিবার। সুতরাং আমরাই সকলে ল্যান্ডরোভার বোঝাই করে বোল্ডার নিয়ে এসে ওই জায়গাটাকে রাস্তার পাশের ফ্ল্যাকের উপর বোল্ডার বিছিয়ে দিতে লাগলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত বোল্ডার এনে কোনোরকমে 'ঠেকা' দেওয়া হল। পরের দিন লোকজন নিয়ে এসে সমস্ত জায়গাটাকে বোল্ডার দিয়ে ঢেকে দিলাম।

উত্তর বাংলায় অনেকদিন আছি। বছরে একবার কলকাতায় আসতে পারি শুধু পূজোর সময়। ফরাক্ক ব্যারেজ হয়নি। অনেক ঘুরে, একবার ট্রেন বদল করে কোচবিহারে আসতে হয়, দুদিন লাগে। সস্তায় ডাকোটা প্লেনে যাতায়াত করা যায়। চামড়া ও তামাকের গাঁটের সঙ্গে যেতে হয়। ভাড়া ৩০/৪০ টাকার মতো। একসময় যে উত্তর বাংলায় আসতে ভালো লাগত না, এখন সেই উত্তর বাংলাকে ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে। এমন সময় একদিন বদলির অর্ডার পেলাম। এবার সমুদ্রের কাছে কাঁথিতে। কাঁথি সড়ক উপভুক্তিতে সহকারী বাস্তুকার পদে যোগ দিলাম। সেটা ১৯৫৪ সাল।

\* এই প্রবন্ধটি পূর্তকথা ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন, ২০০৫) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

# **Fascinating History of Hill Cart Road: new NH-110 (old NH-55)—way to Darjeeling, and its present crisis**

**Rajib Chattaraj**

Chief Engineer, NH Wing, PWD, West Bengal

Email : chattarajrajib@gmail.com

**Debabrata Thakur**

Executive Engineer, NH Division-IX, PWD, Siliguri, West Bengal

Email : debabrata.thakur@rediffmail.com

## **Abstract**

*Darjeeling is one of the most beautiful hill stations of the country and is fondly known as “Queen of Hills”. The name ‘Darjeeling’ came from the Tibetan words, ‘dorje’ meaning thunderbolt (originally the scepter of Hindu God Indra) and ‘ling’ a place or land, hence ‘the land of the thunderbolt.’ The other school of thought about the origin of the name Darjeeling is - the name Darjeeling comes from the word Dorjeling-pa, a Lama. Prior to its acquisition by the East India Co. in 1835, Darjeeling formed a part of Sikkim. In this paper, the authors portrayed the history of Hill Cart Road, the lifeline of Darjeeling. The crisis of capacity-constraints that is being faced now and the endeavours to cater for those, have also been highlighted in the paper.*

## **The Early History**

The length of the road from Siliguri to Darjeeling is around 80 km which is popularly known as Hill Cart Road. It starts from Venus More inside Siliguri City and around 2.5 Km away i.e., at Darjeeling More (Mohon Lal Chowk), the erstwhile NH-55 and presently redesignated as NH-110 starts and continues up to Darjeeling for a length of 77Km.

If we look back to the historical background of Darjeeling, it is stated to have been liked by British when Lord William Bentinck, Governor General of British India sent two officers Captain George Lloyd and J. W. Grant to solve the disputes between Nepal and Sikkim. These two officers stayed in Darjeeling for six days and submitted one report to William Bentinck in 1829. Deputy Surveyor General of India, Captain J.D. Herbert subsequently visited Darjeeling in February and March 1830 to survey the site. Before that, Darjeeling used to be a part of Nepal which came to an end in 1815 when the British mandated Nepal return the tract to Sikkim at the conclusion of the Anglo-Nepalese War (1814-16) by way of the Treaty of Segowlee or Sugauli (1815) and subsequent Treaty of Titalia (1817).

At that time, there was no direct route to Darjeeling, it was accessed through Sikkim and permit had also to be obtained. On 1835, British East India Company took the lease of Darjeeling with the agreement signed by East India Company and the Chogyal of Sikkim- Tsugphud Namgyal against an annual payment of Rs. 6,000/- to the Chogyal of Sikkim. Darjeeling was recognised by the British as a sanatorium and a holiday destination. From 1841, tea plantation in Darjeeling was started after clearing the jungle by Dr. Archibald Campbell, who was appointed as first Superintendent of Darjeeling by East India Company and it became popular. Dr. Archibald Campbell was responsible for the early development of Darjeeling and in his tenure of 10 years from 1839 to 1849, the population of Darjeeling grew

from only 100 to 10,000. On 1850, Darjeeling Municipality was founded. Another British officer General George W. Aylmer Lloyd was given the responsibility of construction of road from Siliguri to Darjeeling. For this work, Lt. John Gilmour was engaged as Executive Engineer on 2nd July, 1838. During 1839-42, problem of construction of the road was faced because of alignment and steep slope. John Gilmour because of his poor health, was replaced by Robert Cornelius Napier, the 1st Baron Napier of Magdala, then a lieutenant. Napier constructed the road which was through dense forest and with steep slope. That road was known as “Old Military Road.” During 1839, another road was started by General Lloyd from Jalapahar Cantonment to Darjeeling Chourasta at the cost of Rs. 8 Lakhs which was known as Calcutta Road. This road too, was not fit for cart movement.

In the meantime, a lot of people from neighbouring states like Tibet, Bhutan, Nepal and Sikkim came to Darjeeling for better employment and living to settle and they started to stay in a place which had become known as “Bhutia Basti.” A new road construction was required, especially this need was also emphasized by the Sikkim Expedition on 1860. Government accordingly sanctioned the construction of a cart road. In 1860, jungles from Kurseong to Darjeeling was cleared, and from 1861 road construction started from Darjeeling to Kurseong which was completed in 1864. The construction of road up to Siliguri was completed by 1869.

In 1861, a treaty was signed between son of Chogyal and the British, which is known as “Treaty of Tumlong”, Tumlong was the then capital of Sikkim. By that treaty, Darjeeling was liberated from Sikkim. The British expanded further into the region using the Anglo-Bhutanese War (1864) and consequent Treaty of Sinchula (1865) to incorporate Kalimpong and the lands east of the Teesta River into British control, thus came into existence the region now commonly referred to as the Darjeeling hills: an area that loosely corresponds to the contemporary administrative districts of Darjeeling and Kalimpong.



(Picture 1: Construction of the metalled Darjeeling Hill Road connecting Darjeeling to Siliguri shown at the half-way point at Kurseong, 19 and half miles away from Darjeeling).

Fred M J Pinn while scripting the history of Darjeeling, described it as “Road of Destiny.” It is also known from other source (Darjeeling Stories- Sahibs, Natives, and Oddballs by Sonam B Wangyal) that *under the supervision of an Anglo-Indian engineer Deewar, the Hill Cart Road was constructed, but no credit had been given to Deewar.* Darjeeling being one of the favourite holiday destinations and a sanatorium, before independence, the Hill Cart Road was one of the most well-maintained roads of the country.

In the year 1919, a Sub-Division office of PWD was established at Kurseong to look after the road. Mr. A.L.P. White took over the charge of the office on 24.04.1919. In 1937, when the Queen of the Britain was on a tour to Darjeeling, the Paglajhora area sank 5 - 6 feet and stones were filled in drums, and wooden planks were laid over the drums to make it motorable in a short period.

During pre- and post-independence period, the road was being maintained by the State PWD. *On August 1992, the road was declared as National Highway 55. Presently, it is redesignated as NH110.* For NH-55, the chainage was started counting from Darjeeling as 0 Km and ended at Mohon Lal Chowk (Darjeeling More), Siliguri as 77km but for NH-110, the counting of chainage has been reversed, the implementation process is under progress.



(Picture 2: The construction of Hill Cart Road).



(Picture 3: Bullock Carts were plying on the road, from there, the name "Hill Cart Road" came.)

At that time, only horse drawn cart and bullock cart were plying on that road, that is why, the road became popular as "Hill Cart Road."

## 2. The start of laying Railway tracks on the same alignment of Hill Cart Road

In 1878, a Company, called the Darjeeling Steam Tramway Company Limited, had been formed, under an agreement, which was entered between Mr. Franklin Prestage, as trustee on behalf of the Company, and the Secretary of State for India in Council, for the purpose of constructing, maintaining, and working a steam tramway from the terminus of Northern Bengal State Railway at Siliguri to Darjeeling. The tramway was to be constructed upon the existing cart road between the above two stations, the Government paying



(Picture 4: Father of the nation Mahatma Gandhi also visited Darjeeling during June, 1925 when he met Deshbandhu Chittaranjan Das, a renowned lawyer, and a great freedom fighter from Bengal.)

the Company for maintenance of the road with all the bridges, embankments, and other works necessary for that purpose, while the Company have undertaken at their sole cost to strengthen the existing bridges and other works so as to carry their tramway with its equipment safely. The work commenced in April, 1879 and within one year, the rails were almost laid upto Kurseong. The line was finally completed for opening to Darjeeling station on the 4th July, 1881, though it was opened for traffic from Siliguri to Ghoom some months earlier. *The railway line was originally built to transport British soldiers and patients to the sanatorium of Darjeeling. The railway track was first laid from Siliguri up to Tindharia with a locomotive workshop at Tindharia built in 1909-1913. DHR obtained the status of World Heritage site on 5th December, 1999.* The Darjeeling Himalayan Railway consists of 88.48 Km of length with 2 feet (0.610 meter) narrow gauge track that connects New Jalpaiguri Railway station with Darjeeling Railway Station, passing through Ghoom at an altitude of 2258 meters (7407 Ft.) which is the highest railway station in India and 14th highest in world. However, the length along the railway track from Siliguri to Darjeeling is 79.2 Km.



(Picture 5: Laying of railway track by the side of Hill Cart Road)



(Picture 6: A locomotive on the line of the Darjeeling Himalayan Railway passing along the main street of the village.)



(Picture 7: Darjeeling Railway Station in early 1900's)



(Picture 8: Ghoom railway station, Darjeeling)

The point to be noted here is, the railway track was constructed after the construction of Hill Cart Road and the railway alignment mostly passed adjacently to the road alignment. There is no tunnel in the railway alignment. Presently, from New Jalpaiguri to Darjeeling, one pair of passenger train trip is available in a day, which starts from NJP at 10.00 am and reaches Darjeeling on 5.00 pm, and from Darjeeling one passenger train starts at 9.00 am, and reaches NJP station at 4.15 pm. However, from Ghoom to Darjeeling, around 8Km, up and down, there are 8 (eight) trips in a day, which is known as "Joy Ride."

So, the main transportation requirement of Darjeeling, both passenger and goods freight are being catered to, through the road transport.

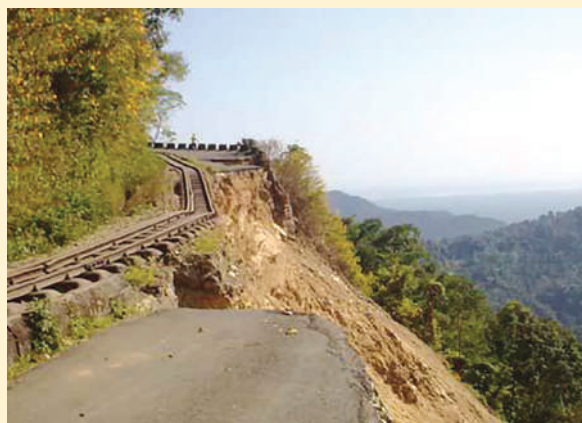
### 3. Problem of road-bench sinking and landslide in NH-110

The mid portion of this road at Tindharia(50-53Km), Gayabari(44Km), Paglajhora(41-42 Km), Mahanadi(40 Km), (chainages counted from Darjeeling side), a stretch of around 15 km length is perpetually land-slide prone zone. As per available record, during 1968, a massive land-slide occurred at Gayabari resulting in the loss of many lives. For the first time in the history of this road, D-50 Chain Dozer was made in use to clear the obstructions and it was operated by Mr. Jeffrey, the owner of Rambuk Tea Garden.

On 3rd July, 1998, Paglajhora area was completely devastated following heavy rainfall in this area. Areas such as Tindharia, Chunabhata and Bokshijhora of Darjeeling recorded other major landslides.

It was on 15th July of 2010, a catastrophic landslide occurred when a stretch of 450 meter of the road slid into the valley and traffic was suspended for nearly one year.

Again, on 18th September, 2011 an earthquake of a magnitude of 6.9 in Richter scale (At Sikkim) occurred followed by heavy rain when three major land-slide occurred at Tindhoria, S1 at 50.25 km with a height of 34.9 mt, S2 at 52.75 Km with a height of 102.8 mt and S3 at 53.48 Km with a height of 38.7 mt.



(Picture 9: Photos of Tindharia Land-slides during 2011)

After persistent efforts and elapse of time, *the land-slides could be restored with an innovative application of Reinforced Earth with a world record of highest RE structure of 102.8 mt. The project was completed on 16.01.2021*



(Picture 10: After restoration, S1 spot, RE structure of 34.9 Mt.)



(Picture 11: After restoration, S2 spot with RE structure height of 102.8 Mt, highest in the world.)



(Picture 12: After restoration, S3 spot with a height of RE structure of 38.7 Mt.)



(Picture 13: Landslide, Darjeeling Siliguri Road, 1993, During 1951)

Almost every year, some slides occur in this road, the last one occurred during last week of August, 2023. The same was restored within the same year.



(Picture 14: Land slide occurred at NH-110 near Saint Merry's Church, Km 37.8 from Darjeeling, during August, 2023)



(Picture 15: Photo of the same spot after restoration)

#### 4. Road connectivity between Siliguri and Darjeeling

NH-55 [New NH-110] from Siliguri to Darjeeling is approximately 77 km long, (en route passing through Sukna, Tindharia, Mahanadi, Kurseong, Sonada and Ghoom). Two other routes, one from Sevoke, Teestabazar, Peshak, Jorebangla, Darjeeling and another via Mirik, Simanabasti, Sukhiapokhri, Ghoom, Darjeeling being a bit longer, the most popular route is from Siliguri to Kurseong via Rohini (This road is named as Subhas Ghising Marg), while ascending because the gradient of this road is less steep and via Pankhabari from Kurseong to Siliguri while descending which has steeper gradient but quicker route to reach Siliguri. But the stretch between Kurseong and Darjeeling can only be accessed via NH-55 (32 Km). Kurseong to Darjeeling through NH-110 have many urban locations namely, Jorebangla (7-8 Km), Ghoom (8-9Km), Rongbull (11Km), Sonada (17-18Km), St Merry's Church (29Km).



(Picture 16: Map showing the Road Network between Siliguri and Darjeeling)

This area is populated, and there are tendencies of houses and shops being constructed by the side of NH by encroachment of lands in many cases. Because of the encroachment problems in many narrow areas, the scope of widening of the road has substantially been reduced. However, constant interaction is being made with the district land revenue department for resolution.

The average daily traffic volume is 13920 PCU including the equivalent PCU for 491 Commercial Vehicles Per Day. The peak hour traffic volume is very high, around 1100 PCU of mainly passenger cars / tourist vehicles, and it increases manifold during tourist season.

### 5. Idea of making the railway track at grade with roadways



(Picture 17: Railway Track running parallel to the NH-55)

The DHR runs parallel to NH-55 from Darjeeling More junction of Siliguri to Sukna, where sufficient formation width is available alongside the road and in these stretches the movement of both rail & road traffic is smooth (Picture 17).

But in the hilly terrain, beyond Sukna, mostly for the portion from Kurseong to Darjeeling, the railway track shares the same carriageway with NH-55 at several stretches due to constraint (occurrence of landslide, road side structures etc.) in the formation width (Picture 18).





(Picture 18: Railway Track sharing the same carriageway with NH-55)

Although transportation of passenger and goods are predominantly dependent on NH-55, the capacity of the NH is very low at several stretches due to restricted formation width. The scope for increasing the formation is not easy due to the occurrence of landslides, obstructions due to road side structures, cost and other geological implications of hill side cutting, etc. Such locations cause congestion during peak-hours, affect the road safety, and decrease the overtaking/crossing opportunities of vehicles. Moreover, the Kurseong-Darjeeling section is dependent on a narrow road corridor, despite effectively Single-Lane facility at some places because of the presence of DHR tracks on the same road formation since vehicles cannot traverse through the tracks due to the significant level-difference between road surface and railway tracks. The details of critically congested stretches are briefed below:

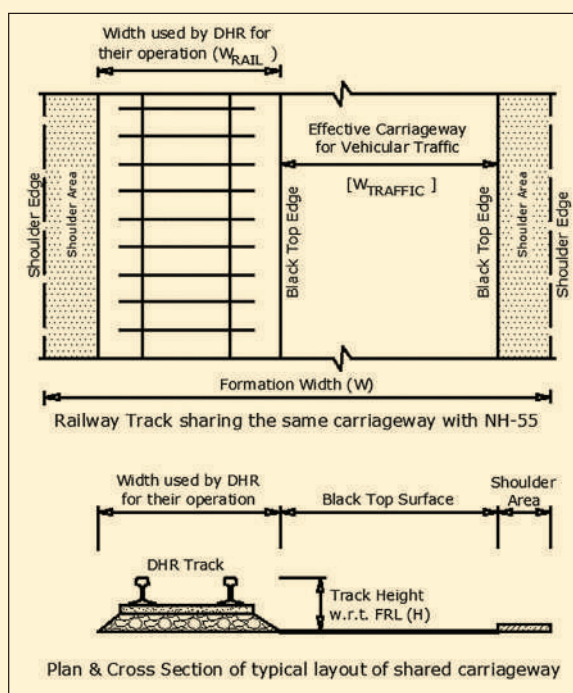
Sl.	Location	Length (km)	Time of heavy congestion	Avg. Queue time	Avg. Queue length	Nos. of occurrences	Services affected
1	Darjeeling town to Jorebungalow	8.800	07:00 am to 11:00 am & 3:00 pm to 5:00 pm	10-15 minutes in normal days and about 1 to 2 hours in peak season	100 meters to 1 kilometre	10 nos to 50 nos [congestion and traffic jam has been observed throughout the day during peak season time]	Essential commodity, public/ tourist transport & emergency services
2	Rangbull	0.300					
3	Sonada to Sani Mandir	2.300					
4	Kurseong tourist lodge to zero point	1.700					
5	Mahanadi	0.300	10.00 am to 3.00 pm	10-15 minutes	100 m (in peak season)	10 nos. -15 nos. [Moderate congestions have been observed]	
6	Tindharia Railway Hospital	0.400	10.00 am to 3.00 pm	20-25 minutes	250 m (in peak season)		

The stretches of NH-55 having the problems in smooth movement of the road traffic on account of shared carriageway (by road and rail traffic in different level) have been identified on 37 locations, which aggregates to a length of approximately 19.0 Km.

There are several crossings of the railway tracks over the NH, most of which are at grade and properly levelled with the existing road surface, allowing smooth and convenient traffic movements. Even if sufficient ROW of the road is not available at such locations, the combined width of the road and railway are utilized effectively by road and rail at same level, as both rail and road traffic are aware of and respect such shared operation. The frequency of trains is quite limited on this stretch and their speed is also restricted.



(Picture 19: Railway track crossing the National Highway at-grade)



(Picture 20: A typical layout of the shared carriageway is indicated in the following figure)

The average dimensions of the carriageway for the shared stretches are detailed below:

Sl.	Location				Average Dimension for each location			
	From (Km)	To (Km)	Length (Km)	Name of the location	Total Formation Width (m)	Width used by DHR for their operation (m)	Effective Carriageway Width for vehicular traffic (m)	Track Height w.r.t. FRL [Difference between Rail top & Black top surface] (m)
					W	W <sub>RAIL</sub>	W <sub>TRAFFIC</sub>	H
1	1.900	2.000	0.100	Darjeeling railway station	7.450	2.200	5.250	(+)0.150
2	2.000	3.000	1.000	Bara kakjhora	7.250	2.050	5.200	(+)0.254
3	3.000	3.800	0.800	Nimkidara	7.250	2.250	5.000	(+)0.610
4	4.000	5.000	1.000	Batasey	7.050	1.650	5.400	(+)0.203
5	7.800	8.000	0.200	Ghoom	7.200	1.700	5.500	(+)0.203
6	8.000	8.800	0.800	Jorebunglow	6.300	1.800	4.500	(+)0.51
7	11.700	11.900	0.200	Wildlife office	6.000	1.550	4.450	(+)0.305
8	12.250	12.450	0.200	near 11 mile	6.350	1.700	4.650	(+)0.914
9	13.500	13.800	0.300	14th mile	6.700	1.900	4.800	(+)0.203
10	14.500	14.800	0.300	near Rangbull	6.400	2.000	4.400	(+)0.430
11	16.700	17.000	0.300	Sonada town	6.750	1.850	4.900	(+)0.430
12	18.000	19.000	1.000	Selestian College to sani mandir	6.650	1.850	4.800	(+)0.203
13	22.400	23.000	0.600	Dilaram	6.400	2.000	4.400	(+)0.150
14	23.500	23.900	0.400	Aringaley	7.050	2.600	4.450	(+)0.430
15	24.100	24.300	0.200	Margrets Deck	7.050	1.650	5.400	(+)0.150
16	24.400	24.800	0.400	Bharat Petrol Pump	6.200	1.850	4.350	(+)0.150
17	24.900	25.200	0.300	Tung Market	7.250	2.950	4.300	(+)0.254
18	25.800	26.200	0.400	below ITI tung	6.420	2.570	3.850	(+)0.254
19	26.900	27.200	0.300	Sepoydhura	6.110	2.240	3.870	(+)0.254
20	29.200	29.800	0.600	St Marys	5.900	1.400	4.500	(+)0.150
21	29.900	30.000	0.100	Whistle Khola	6.500	2.000	4.500	(+)0.150
22	31.600	31.900	0.300	Kurseong Municipality area	6.050	1.800	4.250	(+)0.305
23	31.900	32.000	0.100	Dhobi Khola	6.000	1.500	4.500	(+)0.150
24	32.000	32.200	0.200	Near tourist lodge	6.000	2.200	3.800	(+)0.430
25	32.200	33.700	1.500	Kurseong town	6.140	2.500	3.640	(+)0.150
26	34.100	34.600	0.500	Chowkidara	6.100	2.750	3.350	(+)0.150
27	34.850	35.150	0.300	St Anthonys School	5.450	1.900	3.550	(+)0.150
28	35.600	36.200	0.600	Ropeway	6.300	2.700	3.600	(+)0.150

Sl.	Location				Average Dimension for each location			
	From (Km)	To (Km)	Length (Km)	Name of the location	Total Formation Width (m)	Width used by DHR for their operation (m)	Effective Carriageway Width for vehicular traffic (m)	Track Height w.r.t. FRL [Difference between Rail top & Black top surface] (m)
					W	W <sub>RAIL</sub>	W <sub>TRAFFIC</sub>	H
29	36.800	37.000	0.200	Gidhey Pahad	6.430	2.900	3.530	(+)0.150
30	38.000	38.200	0.200	Dara Gaon	6.400	2.530	3.870	(+)0.150
31	38.700	39.400	0.700	Dhungy Kothi	6.200	2.600	3.600	(+)0.150
32	39.700	40.000	0.300	Mahanadi Bazar	5.760	2.130	3.630	(+)0.250
33	40.000	41.700	1.700	Mahanadi	7.000	2.500	4.000 (avg.)	(+)0.400
34	44.200	44.600	0.400	Paglajhora - Gayabari	7.500	2.500	4.500 (avg.)	(+)1.000
35	48.500	49.400	0.900	Selim Hills	7.500	2.500	4.500 (avg.)	(+)0.200
36	50.000	53.000	1.600	Tindharia Bazar	7.000	2.500	3.500 (avg.)	(+)0.300
37	53.800	53.950	0.150	Near S2,Tindharia	7.500	2.500	4.500 (avg.)	(+)0.500
		<b>Total:</b>	<b>19.150</b>					

A proposal of making the railway track at grade with roadways was sent from the level of Director General of Road Transport, Govt of India to Chairman and CEO, Railway Board on 17th February, 2023. No response from Railway authority has been received so far. Alternative route to Darjeeling, specially from Kurseong should be the long term permanent solution but making road and rail-top at the same level like the tramways in Kolkata is the only immediate feasible solution. An initiative from Darjeeling district administration has been recently taken to move railway authority in this regard.

#### **6. The initiatives taken to do spot widening of the narrow culverts and sharp turnings, Black spots etc.**

For catering to the problem of capacity constraints, a strategy has been adopted to go for spot widening of this NH, wherever bottlenecks are there in form of narrow culverts, sharp turnings, and black-spots. Drainage problems have also been addressed in form of cross-drainage structures and drops and guides to allow the "Jhora" (Streams of water in Hill) for free flowing. On 2022-23 FY, a sanction of Rs. 98.2240 Cr. was obtained from Ministry of Road Transport and Highways, to widen and improve several locations which are already executed or under execution. On 23-24 FY also, a sanction of Rs. 29.5056 Cr. has been approved by MoRT&H which are under tendering process. Some similar jobs are in pipeline to be sanctioned during 24-25 FY.

However, during undertaking of such spot widening jobs, absence of proper land record and encroachment problem has also been come across.



(Picture 21: Some "Under Construction" photographs during recent widening operation of different narrow spots of NH-110)

## 7. Miscellaneous problems faced in NH-110

i) There is very less room for dedicated parking area in NH-110. As a result of which, in several localities like Gayabari, Mahanadi, Kurseong, Rangbull, Sonada, Jorebunglow, Ghoom and the city of Darjeeling itself, cars are parked on the existing narrow NH-110. In all these urban locations, railway track is on one side, and in most cases, houses and shops have been constructed on both the side of the road. Thus, there is apparently no further scope of widening of NH, causing severe traffic congestion during peak season.

ii) Road drainage on this NH is a perennial problem. In urban locations, as mentioned above, the cross drainage remains blocked due to roadside structures. In some places, railway tracks, being mostly at a slightly higher level than the road top, creates obstruction for free drainage on hill road. This causes the surface run-off, especially during the rainy season in huge quantum, flow in longitudinal direction and where it crosses the road, causes rain-cuts and consequent slides. (Picture 14 & 18)

iii) There are several utility cables and posts, including PHE water pipe lines, both underground and above road surface, which further block the natural drainage and the prospect of widening of the road being taken up.

iv) There is a tendency of municipal garbage, including plastic waste being dumped on the valley side of the hill road. The municipal authorities/district administration have been requested multiple times to address the issue.

## 8. Mastic Asphalt as the wearing course in the Hill Roads

Mastic Asphalt as wearing course for the hill roads is proven to be durable (average life 5 years). However, as recommended in the IRC guideline, IRC: 107 and 5th revision of Ministry's specification for road and bridge works, the bitumen to be used in Mastic Asphalt for hill roads should be VG-40 in place of industrial grade bitumen for normal cases. Industrial grade bitumen being very hard, tends to crack in low temperature, which is common in hill roads, especially during winters.

However, in the recently Mastic Asphalt works executed with VG-40, the surface performed in a crack free-way on the same road.



*(Picture 22: Example of low temperature cracking of Mastic Asphalt in NH-110, because of snow fall during February, 2022)*



(Picture 23: Some photographs of recent execution of Mastic Asphalt in NH-110, with VG-40 as binder which performed excellently)

## 9. Conclusion and the way forward

To resolve the present crisis of NH-110, which is the life-line of “Queen of Hills”, all the concerned bodies, especially the citizens of Darjeeling need to come forward and understand the greater interests of Darjeeling as a whole. The road maintaining authorities i.e, NH wing, PWD, Govt. of West Bengal and Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India, are undertaking the necessary endeavours for the public interest.

## References

1. Youtube videos of “The Cord”
2. Facebook page of “Darjeeling History Club”.
3. *Darjeeling Reconsidered- Histories, Politics, Environments* edited by Townsend Middleton and Sara Shneiderman. (Oxford University Press).
4. *The Road of Destiny, Darjeeling Letters 1839* by Fred M J Pinn. (Oxford University Press).
5. Wikipedia for some photographs and information.
6. Darjeeling Raj Bhavan Museum for some photographs.
7. Technical report of LASA regarding TINDHARIA land slide.
8. Concept Note regarding improvement of carriageway of NH-55 (new NH-110) by making road and rail level at grade at different stretches between Darjeeling & Siliguri.

## Acknowledgement

1. Prof. Bhargab Maitra, IIT Kharagpur, Transportation Engg. Department.
2. Samrat Burman, Asst. Engineer, Kalimpong NH Sub-division.
3. Himadri Dey, Tapas Mondal, Dipankar Lama, Asst. Engineer and Palden Tamang, Phurba Sherpa, Pranoy Lama and Prasanta Mondal, Junior Engineer of Team- NH-110.

\* This article has been reprinted from the Souvenir of 228th Mid term IRC Session & Council Meeting at Siliguri, June 2024.

# **Collapse of Baltimore Bridge and wake-up calls for Indian Engineers**

Sanjoy Kumar Nandi

Executive Engineer, NH Wing, PWD, Govt. of West Bengal

Email : sanjoy.nandi@gmail.com

## **ABSTRACT**

Ship-bridge collisions pose a significant threat to bridge infrastructure worldwide, leading to catastrophic failures and loss of lives. This paper examines the impact of ship collisions on bridges, drawing insights from the Baltimore Bridge collapse incident. Additionally, it evaluates the current provisions outlined by the Indian Roads Congress (IRC) for assessing ship/barge impact on bridges and suggests potential improvements.

Keywords: ship-bridge collisions, Baltimore Bridge collapse, Indian Roads Congress

## **1. INTRODUCTION**

Ship-bridge collisions present a significant challenge to the safety and integrity of bridge infrastructure, with potential consequences ranging from structural damage to catastrophic collapses. The collapse of the Francis Scott Key Bridge in Baltimore serves as a sad reminder of the devastating effects of such incidents. In light of this, it is imperative to assess and mitigate the risks associated with ship impacts on bridges. This paper examines the lessons learned from the perspective of safety of the bridges, the Baltimore Bridge collapse and evaluates the existing provisions outlined by the Indian Roads Congress (IRC) for assessing barge impact on bridges.

## **2. HISTORICAL CONTEXT**

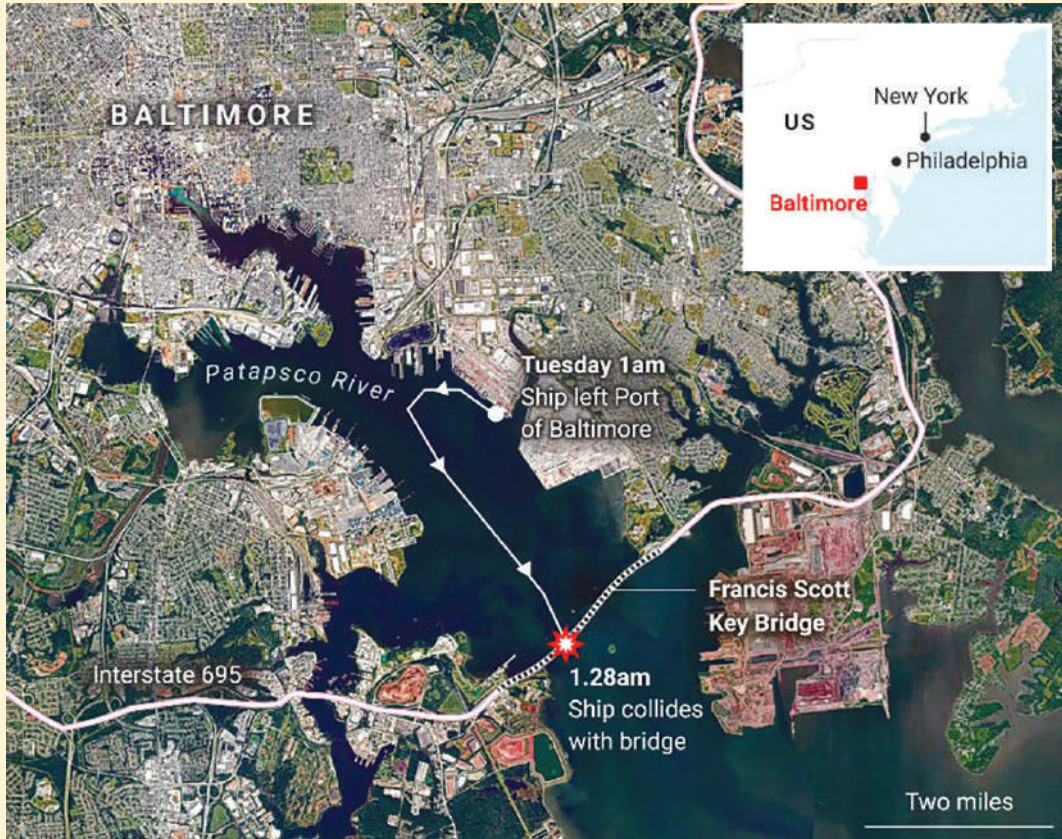
The collision involving the Francis Scott Bridge represents a recurring occurrence, as evidenced by a prior incident in 1980. During this event, a ship collided with the bridge, resulting in significant damage to a fender, necessitating its replacement.

According to a 2018 report from the World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC), between 1960 and 2015, 35 instances of major bridge collapses resulting in fatalities worldwide were attributed to collisions. Collisions between ships and bridges during the 1970s and early 1980s necessitate notable enhancements in the design regulations aimed at safeguarding bridges against impacts.

## **3. BACKGROUND OF THE FRANCIS SCOTT KEY BRIDGE**

Initially named the Outer Harbour Crossing renamed Francis Scott Key Bridge (In honour of the poet Francis Scott Key (1779-1843), renowned as the author of the American national anthem) is characterized by a steel arch-shaped continuous through truss structure, amalgamating the properties of an arch, truss, and cantilever. Situated over the lower Patapsco River, it serves as a conduit for Maryland Route 695 in Baltimore, Maryland, United States. Commissioned nearly 47 years ago in 1977, the bridge historically facilitated an estimated annual passage of 11.5 million vehicles, equating to approximately 31,500 vehicles per day.

The total length of this four-lane bridge amounts to 2632 meters. The span arrangement of this bridge consists of 25 spans measuring 30.48 meters each, along with 9 spans measuring 91.44 meters each, and a main span module comprising segments of 219.46 meters, 365.76 meters, and 219.46 meters respectively. The principal central navigational span, through which all ships and barges traverse, spans a length of 365.76 meters.

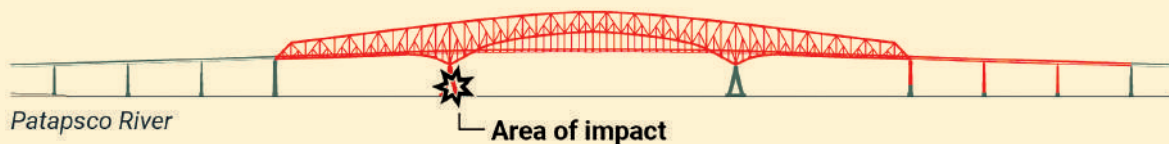


**Fig 1: Location Map of Bridge**

**4. DETAILED ACCOUNT OF THE BALTIMORE BRIDGE COLLAPSE INCIDENT**

On March 26, 2024, at 01:28 Eastern Daylight Time (EDT), the main spans of the bridge experienced structural failure subsequent to a collision with the southwest supporting pier of the main truss section by the Singapore-registered container ship MV Dali. The vessel, owned by Grace Ocean Pte. Limited and managed by Synergy Marine Group, encountered a loss of power at the time of the incident. Notably, the MV Dali was carrying 4,700 containers, despite having a capacity to accommodate up to 10,000 containers. The Dead Weight Tonnage (DWT) of the MV Dali, indicative of its cargo capacity, was approximately 120,000 tonnes. The event was declared a “mass casualty incident.” The collapse resulted in the disintegration of six spans, encompassing a total length of 1,079 meters, comprising segments measuring 219.46 meters, 365.76 meters, 219.46 meters, and three segments each measuring 91.44 meters.

Fig. 2, presented herein after, illustrates the collapsed part of the bridge. The foundation impacted by the ship is marked within this schematic diagram, with the collapsed section of the superstructure conspicuously marked in red.



**Fig. 2: Collapsed part of the Bridge**

Sonar exploration revealed the presence of numerous submerged vehicles, with two individuals successfully rescued from the river. Maryland Governor Wes Moore, recognizing the potential severity of the situation, declared a state of emergency.

Following the incident, insurers are anticipated to face multi-billion-dollar losses encompassing damages, business interruptions, and liability claims. Baltimore Port, a significant economic hub, facilitate approximately 20,000 jobs and supports over 100,000 individuals depends on its economic activity. It is estimated that the port generates \$15 million in daily revenue, contributing approximately \$1.5 million in state and local taxes.

According to Moody's Analytics, the bridge accounted for roughly 7% of the Maryland Transportation Authority's \$755 million toll revenue in 2023. The potential closure of the port could disrupt the shipment of 7,000 parts or components and 3,300 finished products, posing significant logistical challenges.



**Fig .3: Bridge during operational condition**

At the time of the collision, an eight-member repair crew was actively engaged on the bridge. Unfortunately, it is presumed that the repair crew comprises the sole victims of this catastrophic event. Rescue divers recovered the bodies of two victims submerged beneath 25 feet of Patapsco River water within a red pickup truck, located near the mid-span of the wreckage. While two workers were successfully rescued, the whereabouts of the remaining four individuals remain unknown. Subsequent search efforts have been halted due to adverse weather conditions.

The National Transportation Safety Board (NTSB) indicated that Francis Scott Key Bridge was constructed prior to the introduction of redundant support type structures, which are widely used in modern bridges, and would have prevented such a collapse. The graphic shown in next page describes how the ship's collision with one pier of the bridge led to the complete loss of the truss spans through progressive collapse.

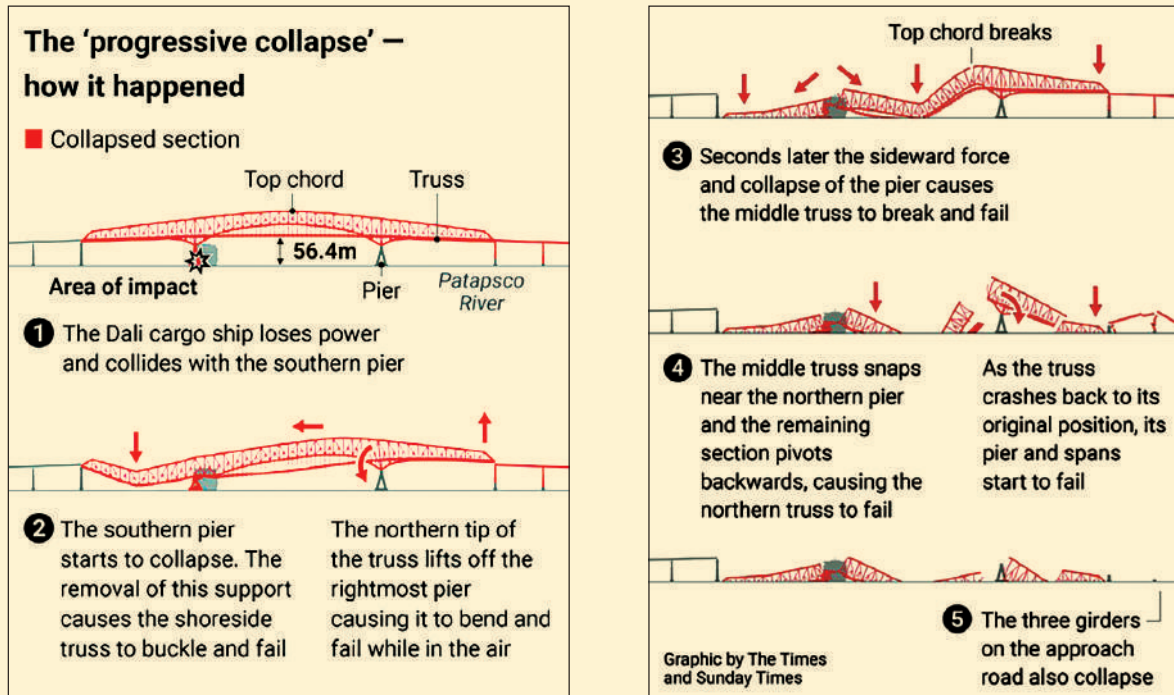
## **5. FACTORS CONTRIBUTING TO THE COLLAPSE**

The collapse of the bridge in question has exerted a considerable impact across social, environmental, and financial domains, prompting inquiries into the accountability of involved parties. The National Transportation Safety Board (NTSB) has initiated an investigation to ascertain the definitive cause of the collapse. The outcomes of this inquiry will serve to identify any entities, including the ship operator, maritime board, or bridge maintenance authorities, potentially liable for the incident.

Pending the NTSB's conclusion of its investigation into the calamity, definitive attribution of the primary cause of collapse remains elusive. Nonetheless, it is evident that several contributory factors to the collapse existed, with the planning, design, and construction of the bridge which played a significant role. Some of the factors contributing to the collapse are discussed below:

### **a) A 20<sup>th</sup> century bridge meets a 21<sup>st</sup> century ship**

The Francis Scott Key Bridge was built through the mid-1970s and opened in 1977. The main structure over the navigation channel is a "continuous truss bridge" in three spans. The bridge was neither designed to withstand the impact from the kind of ship which hit the bridge.



(Courtesy: Andrew Barr, Research fellow at University of Sheffield)

Fig. 4: Progressive collapse of Bridge

- b) There were two layers of protection: a so-called “dolphin” structure made from concrete, and a fender on each side of the bridge piers as protection measures.

The dolphins, situated approximately 100 meters upstream and downstream of the bridge piers, serve as sacrificial elements intended to mitigate the impact of errant ships. Designed to absorb the vessel’s energy and undergo deformation in the process, the dolphins act as a buffer, preventing direct collisions with the bridge structure. Following the dolphins, the fender serves as the final layer of protection. Composed of timber and reinforced concrete, the fender encases the main piers, further dissipating the energy of potential impacts.

However, fenders are not engineered to withstand impacts from exceptionally large vessels. Consequently, when the MV Dali, weighing about 100,000 tonnes, breached the protective barrier of the dolphins, the fender proved inadequate to withstand its immense force.

Consequent to bypassing both the dolphins and the fender, the pier—forming one of the bridge’s primary supports—succumbed to the impact. Ship’s approximate length ( $L$ ) 300 meters and estimated speed ( $V$ ) of approximately 8 knots (equivalent to 4.17 meters/sec), produce impact force ( $P_0 = V^{2/3} \cdot L^2 / 1100$ ) as per ref. 4, around 21000 tonnes.

- c) To navigate safely, the captain of a vessel tries to keep a fairly large distance from other vessels, fixed objects, shallow water, and so on. The distance varies considerably for the specific vessel speed, visibility, type of encounter, and a number of navigational aspects. This safety area around the vessel is denoted as the “ship domain” or “bumper zone” (Fig. 5)

A recommended bumper zone equivalent to at least 3.2 times the vessel’s maximum length ( $L$ ) is advised by Fujii et al. (6) for open sea at normal speeds, which can be reduced to 1.6 times  $L$  for vessels operating at restricted speeds near port or harbour.

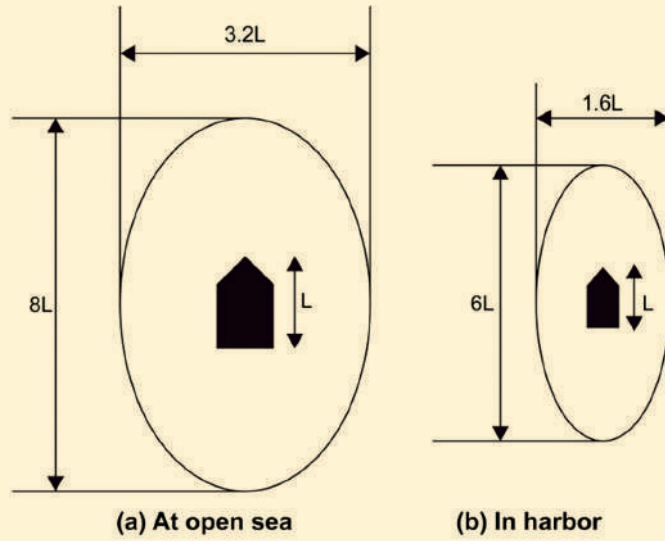


Fig. 5: Bumper Zone of Ship

Considering the ship involved in the collision had a length of 299.92 meters (say 300 meter), the minimum required navigational channel width would be at least 480 meters (1.6L) against the 365.76 meters available here. Hence, a longer span bridge may be a cable-supported bridge would have been more suitable for this scenario. At the time of conceptualization and construction in the 1970s, the prevailing ship sizes were considerably smaller, potentially leading engineers to overlook the necessity for a longer main navigational span.

- d) The steel arch-shaped continuous through truss bridge structure provided in this bridge is a fracture-critical continuous structure. where if one particular element /single element (tension member) fails, it can lead to the collapse of the entire bridge., which has actually happened. A more robust arrangement of ship protection system, should have been provided.
- e) The cargo vessel DALI, responsible for the collapse of the Baltimore bridge, is categorized as a mid-sized container ship, boasting a length overall (LOA) of 299.92 meters and a width of 48.2 meters. At the time of said collapse, the vessel was laden with 4,700 containers, despite possessing a capacity capable of accommodating up to 10,000 containers. The ship's Dead Weight Tonnage (DWT) amounted to approximately 100,000 tonnes.

- f) Fig. 6 below shows the evolution of ship in size and capacity over the last 50 years. It can be seen that the size and DWT of ships have grown more than 8 times over the last 50 years. This bridge therefore could not have resisted the impact of the container ship.

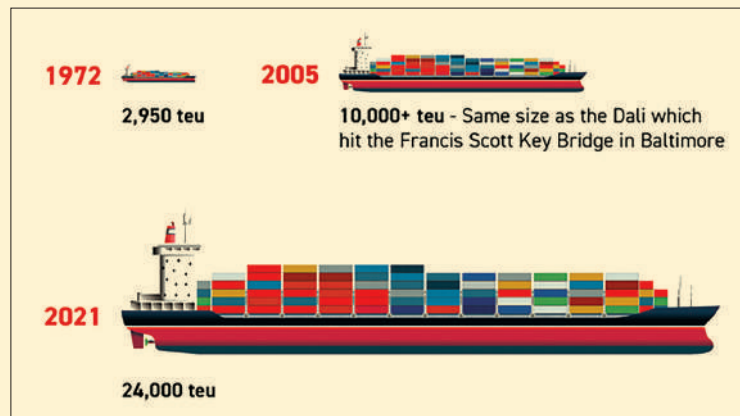


Fig.6 : Evolution of Ship

## **6. LESSONS LEARNED FROM THE INCIDENT**

- a) The collapse of the Francis Scott Key Bridge in Baltimore serves as a stark lesson to bridge owners and designers worldwide. Without prompt implementation of mitigation strategies, the frequency and severity of such accidents may escalate.
- b) With the continual increase in size and Dead Weight Tonnage (DWT) of modern cargo ships, urgent reassessment of existing national and international standards regarding protection against ship/barge collisions with bridges is imperative.
- c) In alignment with other engineering constraints, bridge piers positioned within navigational channels should exhibit robustness and massiveness to withstand vessel impacts. Alternatively, if unprotected, piers should be shielded by independent structures such as artificial islands, structural barriers, dolphins, protective cells.
- d) Importance of safeguarding old and existing bridges situated in major navigational channels against the risk of vessel collisions is paramount. Protecting these bridges will be far more cost effective than taking the risk of damaging a bridge and facing the consequences.

## **7. CURRENT INDIAN ROADS CONGRESS PROVISIONS AGAINST VESSEL IMPACT & WAKE-UP CALL**

The methods of analysis of bridge subjected to barge impact, are given in IRC: 6 code. It is semi-deterministic and involves a great number of simplifications and assumptions. The true dynamic structural response due to the load time-history is approximated by an assumed equivalent static response.

Ships and Barges are different. Any watercraft having considerable size is referred to as Ship or Vessel. But a Barge is that type of vessel which has large flat bottom generally used for transporting goods on Inland waterways. Ships sail in both inland as well as international waterways but the barges are typically seen in Inland waterways only.

Bridges in sea will have deep draft waterway where ships are likely to ply. These bridges are to be designed to cater to Ship Impact forces, which is much higher than the barge impacts. This is not covered in this IRC : 6 clause. Specialist literature is referred for such cases.

The main objective of considering barge impact load is to minimize the risk of the structural failure of a bridge component as well as reduce the risk of damage to the barge due to collision with a moving barge. Localised repairable damage of substructure and superstructure components is permitted provided sufficient ductility and redundancy exist in the remaining structure to prevent consequential progressive collapse in the event of impact.

As the barge collision load is an accidental load so design of bridge substructure to be done under ultimate limit state.

India currently boasts approximately 14,500 kilometers of navigable waterways, comprising rivers, backwaters, canals, creeks, and similar water bodies. Prior to 2016, only five national waterways were recognized. However, in 2016, an additional 106 national waterways were designated. Consequently, pre-2016 constructed bridges are not engineered to withstand barge impact forces, rendering them vulnerable. Conducting a comprehensive risk assessment for these vulnerable bridges and implementing appropriate protection measures is imperative to mitigate the risk of failures.

## **8. INTERNATIONAL DESIGN CONSIDERATIONS FOR VESSEL IMPACT RESISTANCE**

To minimize the occurrences of damage to bridges due to vessel collision, American Association of State Highway and Transportation Officials' (AASHTO), "Guide Specification and Commentary for Vessel Collision Design of Highway Bridges" published in 1991.

The International Association for Bridge and Structural Engineering's (IABSE) "Ship Collision with Bridges Guide", published in 1993.

In Australia, adherence to the Australian Standard for Bridge Design (published in 2017) mandates that designers contemplate the potentiality of the largest vessel expected to navigate the waterways within the ensuing century and the consequential impact were it to approach any bridge pier at full velocity. Design considerations extend to evaluating the outcomes of both direct head-on collisions and oblique side-on impacts. Consequently, numerous contemporary bridge designs incorporate protective measures for their piers, often in the form of man-made islands.

## 9. CONCLUSION

Ship-Bridge collisions pose a significant threat to bridge safety and require careful consideration in design and management. By drawing insights from the Baltimore Bridge collapse and evaluating the current Indian Roads Congress provisions, this paper aims to draw the attentive consideration for assessment of Ship/Barge-Bridge collision and promote safer bridge infrastructure in India. It is imperative that proactive measures be taken to assess and mitigate the risks associated with Ship/Barge impacts on Bridges, ensuring the safety and resilience of critical transportation infrastructure.

## 10. REFERENCES

1. *The collapse of Francis Scott Key Bridge, Baltimore* by Dr. Subramanian Narayanan, *linkedin.com*, April 2, 2024.
2. *Lessons Learnt by Bridge Owners and Bridge Designers from Baltimore Bridge Collapse* by Alok Bhowmick, *IAStructE Newsletter*, March 2024.
3. *New Barge Impact provisions in IRC:6 for Design of Bridges located in Waterways* by Lakshmy Parameswaran, Alok Bhowmick, T Viswanathan published in *Indian Highways*, October 2011.
4. *Ship Collision with Bridges: The Interaction Between Vessel Traffic and Bridge Structures*, IABSE SED 4, 1993.
5. *IRC:6-2017: Standard Specifications and Code of Practice for Road Bridges, Section-II Loads and Load Combinations (Seventh Revision)*
6. *The Times*, UK, March 26, 2024.
7. *The Sunday Times*, UK, March 31, 2024.
8. *POLITICO--Digital Newspaper-* March 27, 2024.
9. *Down to Earth—News Magazine*, March 27, 2024
10. *Survey on Vessel Traffic Management Systems and Brief Introduction to Marine Traffic Studies* by Y. Fujii et al. *Electronic Navigation Research Institute Papers (Japan)*, No. 45, 1984.
11. *Map Space Modeling Method Reflecting Safety Margin in Coastal Water Based on Electronic Chart for Path Planning* by Da-un Jang and Joo-sung Kim, *Sensors* 2023, 23(3).

*\* This article has been reprinted from the Souvenir of 228th Mid term IRC Session & Council Meeting at Siliguri, June 2024.*

# Environmental Management For Construction Site With Particular Reference To Multipurpose Cyclone-Shelter (MPCS) In Coastal Districts Of West Bengal

Biswajyoti Sahoo

Safety & Environmental Expert and Research Scholar

Email : biswajyotisahoo@gmail.com

Kausik Banerjee

Ex Chief Engineer, PWD & Ex Guest Faculty, IEST, Shibpur

Email : kausik56@gmail.com

Tapan Kumar Pusti

Civil Engineer, Arkitechno Consultant (P) Ltd.

Email : tapan.pusti@gmail.com

Construction projects have become one of the driving forces for the national economy, whose energy consumption, environmental emissions and social impacts are significant. Construction practices can cause damage to all the three components of environment namely water, land and air. It is expected that the fragile environment may get damaged because of the adverse impacts of construction. These impacts include resource depletion, biological diversity losses due to raw material extraction, landfill problems due to waste generation, lower worker productivity, adverse human health due to poor indoor air quality, global warming, acid rain, and smog due to emissions generated by building product manufacture and transport that consumes energy. The risk to the environment is particularly high when work is done near coastal areas, streams and creeks or along a river valley.

In this respect, there are some good engineering practices which need to be adopted like Pre-Construction Mitigation Planning, Environmental Assessment, Risk Assessment, Risk Management and a holistic Environmental Management Plan (EMP).

This paper attempted to give an overview of the Environmental Guidelines for major construction sites followed by a case study on construction of 146 nos. of Multi Purpose Cyclone Shelter(MPCS) at coastal districts of West Bengal under National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP-II) funded by World Bank.<sup>1</sup> and executed by Deptt. of Disaster Management through PWD.

**Keywords :** Cyclone shelters — estuarine ecosystem - effect of construction - EMP - good Engineering Practice

## 1. INTRODUCTION

The coastal area of West Bengal extends over 0.82 million hectares and 220 km. of coastal line. Muddy coast accounts for 350 km., of which 90% are treated as marshy zone having halophytic vegetation and their associated flora and fauna; only around 40 km. is considered as sandy belts. It includes three coastal districts, South 24 Parganas and North 24 Parganas, supported by Sundarban Mangrove Ecosystem and Midnapore Coast having

sand flats and degraded mangrove patch. Indian part of Sundarbans occupies mangrove area (4262 sq. km) slightly more than that (4109 sq. km) of highly reclaimed counterpart in Bangladesh (Chakraborty, 2011). The coastal belt of Midnapore district represents 27% of West Bengal of coastal tract (60 km) extending along the west bank of Hooghly estuary from New Digha and then curving around Junput, Dadanpatrabarh, Khejuri and Haldia on the east to the further north east up to Tamruk or even on the bank of Rupnarayan (Fig-1).

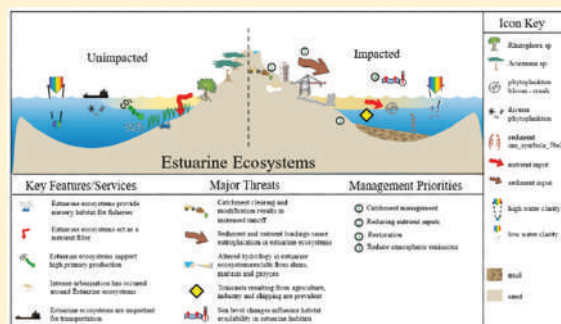


Fig-1: Major threats and management practices in estuarine ecosystems

## 1.1. BACKGROUND

West Bengal is a relatively small state in India's east but with a population of more than 90 million it is amongst the highest density states in the country. West Bengal has suffered from cyclones, floods, droughts and earthquakes. The most destructive element associated with an intense cyclone is storm surge which leads to inundations and coastline washout/erosion. High storm surge in coastal WB is due to its peculiar bathymetry and the nature of the coastal belt. The northern part of the Bay of Bengal is very shallow. The coast is also landlocked on three sides. As a result, when a very severe cyclonic storm or cyclone approaches the coast, the enormous storm surge generated by the wind pressure submerges the coastal belt. Another peculiar characteristic of this coast are the innumerable rivers and rivulets



Fig- 2: Map of West Bengal showing different islands

criss-crossing islands that have elevations of 4 to 5 m. above sea level. This makes these islands and the populations inhabiting them highly vulnerable. The coastal stretch of WB is highly vulnerable to cyclones and the frequency of storms crossing this belt is high. WB has suffered from cyclones, floods, droughts and earthquakes. On May 25th

2009, a severe cyclone, 'AILA' lashed at the WB coast causing destruction not only in the coastal blocks but also far inland. Department of Disaster Management & Civil Defence, Govt. of West Bengal has been entrusted with the construction, operation and management of the proposed Multipurpose Cyclone Centres (MPCS) envisaged in NCRMPII project. The coastal districts of West Bengal are vulnerable to severe cyclonic storm. Districts like South 24 Parganas, North 24 Parganas and Purba Medinipur experience frequent cyclones having disastrous consequences on human life and animal population of the region (Fig-2). The NCRMPII project aims at safeguarding the natural calamities like flood, cyclone, tsunamis to certain extent.

## 2. OBJECTIVE OF THE STUDY

The main objective of this study is to identify the major impacts of construction activities in coastal zones of West Bengal and suitable mitigation measures thereof. The study sought to identify the perceptions of practitioners, consultants and contractors regarding the impacts of construction activities on the coastal fragile ecosystems and to implement environmental guidelines of minimizing the impacts.

## 3. PROJECT DESCRIPTION

### 3.1: Project Area: Ecologically Sensitive Zone

The Sunderbans, represents a sensitive ecological region that is split across the international boundary of India and Bangladesh in South Asia and represents an unique ecosystem unparallel to anywhere else in the world due to its spectacular mangrove forest and amazing biodiversity. Home to a wide variety of highly endangered flora and fauna the region deserves special conservation status. However, the mangrove vegetation has been negatively impacted as a result of unrestricted growth of local human population well beyond the carrying capacity of this fragile ecosystem. *The local mangrove vegetation (Fig 3) is a nature's safeguard in the form of a protective shelter belt to the devastating cyclones impacting this region from geological past.* The rapid and unrestricted destruction of this natural shelter belt is soon or

later going to have serious environmental impacts in South Bengal and adjoining region including the city of Kolkata, India.



*Fig-3: Progressive deterioration of coastal mangrove vegetation due to severe anthropogenic pressure, environmental pollution and natural disasters*

### 3.2: Main Features of the Project

The Project (NCRMP-II) intends to reduce vulnerability to cyclone and other hydro meteorological hazards of coastal communities in project State, and increase the capacity of the State entities to effectively plan for and respond to disasters. *The project is part of a broader national multi-hazard mitigation program taken up by the NDMA that includes understanding hazards like seismic risk, floods, landslides and establishment of a National Disaster Management communication network.*

The project is being funded by the World Bank as an Adaptable Programme Loan (APL). NCRMP-II (National Cyclone Risk Mitigation Project) In the three coastal districts of West Bengal i.e. South 24-Pgs., North 24-Pgs. and Purba Medinipur, 150 Nos. of MPCs are proposed to be constructed under the scheme NCRMP-II with WB aided fund and State Fund (25%). *The MPCs has a multi-pronged approach in catering to the needs especially of the disadvantaged sections of the populace through a string of activities such as:—*

- ❖ Minimization of loss of lives, property and livestock by providing it shelters during cyclone calamity.

- ❖ MPCs will act as nodal points for receipt and dissemination of cyclone warnings. MPCs will provide the warehousing facilities of essential stocks/items for post disaster usage.

- ❖ The nodal points for carrying out post-disaster response and relief activities will be from MPCs.

- ❖ MPCs will also provide temporary protection from the heavy torrent during the monsoon and also from the scorching heat during the summer to the shelterless people.

- ❖ Basic health services like immunization programmes can be administered through these MPCs.

- ❖ MPCs will act as models for safe construction in vulnerable seismic zones.

## 4. MAJOR PROJECT ACTIVITIES

The identified major activities during disaster shelter construction are given below:

- ❖ Selection of site - The new disaster shelter/school buildings with access road have been constructed at the same premises of the existing schools; those have been identified during implementation stage. The construction does not require any land acquisition.

- ❖ Mobilization of material and equipment and establishment of labour camp.

- ❖ Excavation for foundation work

- ❖ Dewatering

- ❖ Reinforcement, concrete casting of footing or pile cap for Piling work

- ❖ Form work, reinforcement, concrete casting for superstructure including beam, columns and slab.

- ❖ Rehabilitation/Construction of structures

- ❖ Finishing work includes partition wall, painting, electrical works etc.

- ❖ Sanitary and drainage work, plumbing work etc.

- ❖ Wood and allied works, steel and allied works

- ❖ Site clearing and managing all construction work



Fig- 4: Mandarmani MPCS of Purba Medinipur under construction

## 5. LEGISLATIONS

The legislations applicable to different subproject activities:

- ❖ The Environment (Protection) Act, No. 29 of 1986.
- ❖ Water and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & 1981 (Central Act 6 of 1974) and amendments thereafter.
- ❖ Forest (Conservation) Act No. 69 of 1980 and amended in 1988.
- ❖ The Wildlife (Protection) Act 1972, Amendment 1991.
- ❖ Biological Diversity Act 2002 and Biological Diversity Rules 2004.
- ❖ Coastal Regulation Zone (CRZ) Regulations, 1991 (amended upto 2011)

## 6. ASSESSMENT AND PREDICTION OF IMPACTS:

Based on the construction activities the following environmental issues are raised generally.

- Surface and ground water pollution
- Air Pollution
- Soil Erosion
- Noise Pollution
- Disruption of natural systems
- Damage of Trees and Vegetation

The impacts can be sub-divided in pre-construction, construction and operation & maintenance phase.

### 6.1: Pre-Construction Phase

- Loss of Land—The construction does not require any land acquisition. During design phase it was assessed and alternate options were explored to identify suitable land, which have less impact on agricultural production.
- Setting up of Labour Camps—Improper site selection for labour camp may affect environment.

### 6.2: Construction Phase

- Surface Water Pollution—Nearby water body may be polluted due to disposal of construction wastes or wastes from labour camps of the building project.
- Ground Water Pollution—Septic tank and soak-well deepened up to underground water table may act as media to pollute water, which may be cause of waterborne disease.
- Air Pollution—Air pollution may be triggered from a wide range of construction activities, including movement of vehicles, operation of construction equipment and generators.
- Drainage congestion—Temporary drainage congestion often results from obstruction to natural flow of drainage water due to the storage of materials, piled up excavated material/soil and temporary embankments constructed to keep the work area dry. Improper dumping shall impact natural drainage courses.
- Soil Erosion—Soil erosion increases in the construction site because of indiscriminate removal of grasses and turf from the site and dumping of carried earth on the site without proper compaction layer by layer.
- Noise Pollution and increased Vehicular traffic—Could generate from Heavy machineries used during construction, especially during pile driving works and also from movement of vehicles, operation of construction equipment and generators.
- Disruption of natural systems—Construction of shelters disrupts the existing ecology and natural system of the locality. Wild animals like foxes, jackals, snakes, frogs, etc. have to leave the area.
- Trees and Vegetation—Tree felling may be required to clear the site for building construction. Live vegetation will be disrupted. Water bodies

are sometimes filled, which causes destruction of plants grown under water.

- Ecological impacts—Based on primary assessment of the nature and assessment of sub-project locations (based on field visits), it appears that ecological impacts are not likely to be significant for most of the proposed sub-projects. However, the ecological impact should focus on:

- (a) Impact on flora (aquatic and terrestrial)
- (b) Impact on fauna (aquatic and terrestrial) including fish.

- Health and Safety—Health and safety of workers and students of adjacent school must be taken into account while construction activities are on. The contractor must provide safety gears and first aid to workers.

- Environmental Pollution from Solid/ Construction Waste—In many sub-projects, considerable construction debris (e.g., demolition of existing structures) is likely to be generated from different sub-project activities. Solid wastes will also be generated from labour sheds. Improper management of construction debris and solid waste could cause blockage of drainage line/ path and environmental pollution.

### 6.3: Operation and Maintenance Phase

- Water Logging—Due to improper planning and construction stormwater drainage congestion / water logging may be created.

- Additional Burden on Utilities—Construction of new cyclone shelters create additional burden



Fig-5: Excavation of earth during construction work at Chaital



Fig - 6: MPCS construction work in wet land of North 24 Pgs Pallimangal High School Ground MPCs, Norh 24 Pgs.

on the existing system of utilities like water supply, sewerage, electricity, gas, telephone and road network etc.

- Operation and Maintenance of Environmental Utilities—Lack of O&M of the environmental utilities is very nuisance to environment and worsens the environment if they are not there at all. Regular cleaning person of the utilities (sweepers) should be appointed.

- Excessive Use of Energy—Implementation of cyclone shelter projects create facility for more people and consequently increases demand for electricity and other form of energy etc.

## 7. PUBLIC CONSULTATION

The community meeting has been suggested to discuss the subproject, identify the community priority and identify the scope of work. Public consultation is generally a continuous process aimed at engaging the stakeholder efforts throughout the planning, design, construction and operation of a project. The objectives of consultation and access to information are to generate public awareness by providing information about a sub-project to all stakeholders, particularly the sub-projects affected persons (PAPs) in a timely manner and to provide opportunity to the stakeholders to voice their opinions and concerns on different aspects of the project. The opinions and suggestions of the stakeholders would assist in taking appropriate decisions for effective environmental management of the sub-projects and further improvement.

## 8. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP)

The Environmental Management Plan (EMP) is a set of measures for avoidance, minimization and mitigation of adverse environmental impacts. The Contractor will abide by the environmental, occupational health and safety measures listed in the Environment Management Plan (EMP) given in the table below during preparation and execution of Works. Adverse impact/s on the environment caused due to non-adherence of legal and EMP requirements during preparation and execution of civil works may invite Non-compliance Report and shall be made good at the Contractor's own expenses.

The complete document on Environmental and Social Management Framework (ESMF) from which these conditions have been derived/ listed is available with State Disaster Management Authority (SDMA) for the Contractor's reference. It is also available on the websites of National Disaster Management Authority (NDMA) and State Disaster Management Authority (SDMA).

## 9. Conclusion :

Construction activities in coastal zone affect the environment many fold throughout the life cycle of development. These impacts occur from initial work on-site through the preconstruction, construction period and operational period. Even though the construction period is comparatively shorter in relation to the other stages of a building's life, it has diverse significant effects on the environment. For that matter, there is progressively growing concern about the impact of construction activities on human and environmental health and its mitigation measures. Client, Deptt. of Disaster Management and PWD, Personnel of Third Party Quality Auditor and working agencies collectively worked as a team for effective implementation of EMP.

## Acknowledgement :

Authors express their gratitude to all Engineers of Disaster Management Deptt. and Engineers of PWD, Govt. of West Bengal for their inspiration and support in this regard.

## References :

1. *Construction health and safety in coastal and maritime engineering*, Ian Cruickshank Stephen Cork.
2. *Environmental Guidelines for Major Construction Sites*, Environment Protection Authority, Victoria 3000, AUSTRALIA, February 1996.

3. *The Coastal Regulation Zone of Goa: Oceanographic, environmental and societal perspectives*, Antonio Mascarenhas

4. *National Disaster Management Guidelines, Management of Cyclones*, National Disaster Management Authority, Government of India.

5. *Draft Terms of Reference for a Construction Supervision Consultant*.

6. *National Building Code of India 2005* - <http://bis.org.in/sf/nbc.html>

7. *Guidelines, Disaster Management Act, 2003, Mitigating adverse impacts of cyclones, Evacuation and Shelter*.

8. *Bangladesh: Coastal Towns Environmental Infrastructure Project—Mathbaria Cyclone Shelter Subproject*, Prepared by the Local Government Engineering Department.

9. *Environmental Impact Assessment Notification, 14th September 2006 & as amended up to 1st December, 2009*, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

10. *CRZ Notification, 19th February 1991 & as amended up to 24th July 2003*, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

11. *National Cyclone Risk Mitigation Project—Environmental & Social Management Framework*, May 15, 2009. National Disaster Management Authority, New Delhi.

12. *Investment Proposal—National Cyclone Risk Mitigation Programme—Part-B1: Cyclone—Shelters*, December 2008. Orissa State Disaster Management Authority.

13. *Investment Proposal—National Cyclone Risk Mitigation Programme—Part-B2: Connectivity to Cyclone Shelters*, 7th July 2009. Orissa State Disaster Management Authority.

\* This article has been reprinted from the Souvenir of Annual General Meeting, Silver Jubilee Year 2017, Indian Buildings Congress (IBC), WB State Centre at Kolkata

# 83rd Annual Session of Indian Roads Congress held during 8th to 11th November, 2024 at Pandit Dindayal Upadhyay Auditorium & Science College Ground, GE Road Raipur, Chhattisgarh : A brief Report

Anupam Karmakar

Executive engineer, PWD

Email : karmanup2010@gmail.com

The Indian Roads Congress (IRC) organizes its Annual Session to foster collaboration, innovation, and knowledge exchange within the realm of road and transportation engineering. The Chhattisgarh government has extended the courtesy to all the delegates in Raipur. More than 2000 delegates from the country and abroad participated in this event. It serves as a platform for discussing emerging trends, sharing best practices, and addressing challenges related to road construction, maintenance, and safety. The Annual Session also provides an opportunity to present and deliberate on research findings, policy developments, and technological advancements. By facilitating networking and dialogue, the IRC aims to contribute to the continuous enhancement of India's road infrastructure, promoting sustainable and efficient transportation systems.

## Venue :

Pandit Dindayal Upadhyay Auditorium & Science College Ground, GE Road Raipur, Chhattisgarh

## About The state of Chhattisgarh :

Important landmarks of the state are—Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Gangrel Dam and Satrenga, Vilai Steel Plant, International Hockey Stadium, Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya, International Tennis Academy.

- Natural wonders are—Chitrakote Falls, Kotumsar Cave, Tirathgarh Waterfall, Mainpath, Jatmai Ghatarani, Barnawapara Wildlife Sanctuary.
- Wildlife & forest areas—Indravati National

Park, Nandavan Jungle Safari, Achanakmar Tiger Reserve, Sitanadi Wildlife Sanctuary.

- Spiritual & Religious places—Danteswari Temple, Bamleshwari Temple, Champaran, Rajib Lochan Temple, Ratanpur, Giraudhpuri Dhum, Mahadev Ghat.
- Cultural & Historical places—Sirpur, Boramdev, Barsur, Purkhauti Mukangan, Baster Dussehra.

## Accommodation :

Government of Chhattisgarh made nice arrangement for all delegates of IRC with delicious food.

## Travel information :

Government of Chhattisgarh made nice arrangement for travel with well-maintained vehicle issued to all the delegates from the Airport and Railway station.

## Food :

Two big Dinning Halls were arranged for Lunch & Dinner of the delegates at the Venue. Different types of delicious mouth-watering food are there with local foods and foods of all the regions of the country.

## Medical facilities :

Medical facilities remained available at the venue.

## Social and ladies programme :

Social activities and Programme for the Spouses and other family members of the attendees were arranged by the organiser which were colourful and enjoyable.

## Programme :

Member registration was done from Registration Lounge (Shivnath Hall).

Technical Exhibitions were arranged on Hall-1 (Chitrakote Hall) and Hall-2(Tirathgarh Hall) where numbers of manufacturers showed their updated products and usage. This was a very good opportunity to explore about the advanced techniques and materials for road construction and road safety in particular.

On **08th November'2024**, 230th Council Meeting of IRC was started at Rajim Board Room. **Technical session-1** (8nos topic) for engg. Students / research scholars was arranged on Bhoramdev Hall. **Technical session-2** (Poster Competition on innovation in Road Sector). **Technical session-3** (5nos topic) for R&D Organisation was on Sitanadi Hall. **Technical session-4** (6nos topic) for private stake holders (equipment / machinery / material / software, manufacturers etc.) was at Bhoramdev Hall. **Technical session-5** (5nos topic) development in rural roads at Bhoramdev Hall. **Technical session-6** (4nos topic) for ngo, innovative entrepreneur, agency etc. was at Sitanadi Hall. Inaugural function was arranged in Kanger Hall followed by Cultural Programme. Hon'ble Union Minister, Shri Nitin Gadkari inaugurated the session and delivered his own speech.

In **09th November'2024**, 84th meeting of Highway Research Board was at Rajim Board Room. **Technical session-7** (3nos topic) presentations on papers published in IRC journal was at Bhoramdev Hall. **Technical session-8** (4nos topic) presentations by contractors, consultant & other organizations was at Sitanadi Hall. **Technical session-9** (11nos topic) presentations by private stake holders (equipment / machinery / material / software, manufacturers etc.) was at Bhoramdev Hall. 230th Council Meeting of IRC continued at Rajim Board Room. **Technical session-10** (4nos topic) presentations on papers published in IRC journal was at Bhoramdev Hall. **Technical session-11** (4nos topic) for academicians/ morth chair professor was at Sitanadi Hall. **Technical session-12** (4nos topic) talk by national/international expert was at Bhoramdev Hall.

On **10th November'2024**, PS/Secretaries(PWD)/E-in-CS/CES meeting was at Rajim Board Hall. **Technical session-13** (4nos topic) for presentation on GRRRI-Road Research work done in india was at Bhoramdev Hall. Voting of IRC Members

for Election of Council Members under different category was done in very systematic manner.

**Technical session-14** (4nos topic) presentation by officers of state government departments (PWDs, local bodies, PSUs) was at Bhoramdev Hall.

**Technical session-15** (4nos topic) presentation on paper published in IRC journal was at Sitanadi Hall. **Technical session-16** (8nos topic) panel discussion on quality assurance and quality control on highways projects was at Bhoramdev Hall.

**Technical session-17** (4nos topic) presentation by officers of central govt. Departments, (MORTH, NHAI, BRO, CPWD, NHIDCL, NRIDA) was at Bhoramdev Hall. **Technical session-18** presented by Individual Awardee was at Sitanadi hall. 83rd Business meeting done at Bhoramdev Hall followed by Cultural Programme at Kanger Hall.

Er. Dilip Kumar Baidya, Engineer in Chief & EO Secretary, PWD; Er. Muztarab Hussain, CE, HQ, PW(R)D; Er. Rajib Chattaraj, CE, NH, PW(R)D; Sanjoy Kr Dutta, CE, SZ, PW(R)D; Er Ranjan Kumar, SE, WHC-I, PW(R)D; Er Kuntal Gonai, SE, P&M Circle, PWD; Er Raja Chattopadhyay, SE, CH Circle, PW(R)D; Er Sujan Kanjilal, ACE-I, PW(R)D; Er Papri Mandal, TA, Finance; Er Rudranath Bhattacharjee, EE, WHDD-I, PW(R)D; Er Soumyajit Maiti, EE-I, City Division, PWD; Er Samir Pal, EE, DD-I, PWD, Er Surojit Kundu, EE, Kalimpong Div, PWD and myself attended as Government Delegates from PWD, West Bengal. We enjoyed and learned from this event in all respect. Overall, it was a great experience of being there and enjoyed the event to a great extent with the all delegates with cultural and technical exchange with the engineers from all over the country.

In **Technical Session-14**, presentation on “**Mechanised Mastic Asphalt - An Air-Pollution Compliant, Sustainable Road Construction Technology best suited for the Roads of Kolkata City**” by Shri Rajib Chattaraj, Chief Engineer, National Highway Wing, Public Works (Roads) Directorate, Government of West Bengal was a splendid & excellent presentation. The high officials of other states expressed interest on this technology.

This presentation impressed me as I am personally experienced with this product. It was applied over a major part of Kolkata Maidan road during 2022-23 under my supervision.

Presentation on “A New Approach for Determining Rejuvenator Dosage for Designing Bituminous Mixes with Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Material” by Shri Thavamani Andiyappan, Research Scholar & Dr. G. Gurunath, Former Research Scholar, Transportation Engineering Section, Department of Civil Engineering, IIT Kharagpur was also a new concept of bitumen rejuvenator. Presently 30% RAP is allowed for recycling and they claimed to raise the limit which will help commercial application of RAP in an economically feasible way.

Presentation on “Epoxy Asphalt Modified Binder (Make- Chemco Systems, California, USA) and Overlay Systems for Durable and Smooth Riding Pavements for Bridges, Rigid and Flexible Pavements” by Mr. Mridul Goyal, M/s SSPI Industrial Products LLP, Maharashtra was also a very interesting and promising presentation.

More or less all presentations were very interesting and I could learn some new dimensions of our subject.. Interacting at a few stalls like Kataline, Zydex, Asianpaints, Jalnidhi, PPG, Kraton, Avantech, 3M etc was also very interesting.

The most pleasant experience was to interact with the 3rd year students of NIT Raipur and other Engineering colleges who were there with their 3rd year projects.

An immersive experience of Chhattisgarh’s cultural Ethos & vibrant cultural tradition were showcased over the course of event i.e. Mallakhambah Act, Gedi dance, Bhangra performance, Karma Nritya, Nata Sutra-Odisi dance, Sugandha Mishra, Sand Art, Sudesh Bhosle, RJ Namit. Very attractive Post-Session Tour was also arranged by the organiser.

It was a significant event dedicated to deliberating on the future of India’s road infrastructure. This gathering brought together the policymakers, experts, and leaders from various sectors to envisage a smarter, safer, and more efficient transport system for India. It was a pivotal event that set the stage for transforming India’s road infrastructure. With a clear vision and a commitment to leveraging advanced technologies, India is poised to create a transportation system that is safe, efficient, and sustainable. The event, guided by the vision of Honourable Road Transport and Highways Minister Shri Nitin Gadkari, was supported by Honourable Minister of State MoRTH, the Chief Minister of Chhattisgarh, the Deputy Chief Minister, and other leaders. Together, they promised a collective commitment to advancing India’s road infrastructure.

Thanks to the organising committee of Chhattisgarh Govt. for arranging such a gigantic event in very easy and systematic way. Some pros & cons exist in every event but the entire event was very nice, charming, enjoyable & appreciable in all respect.





## স্মৃতিকথন



### তরুণ ভট্টাচার্য

জন্ম : ৭ ডিসেম্বর ১৯৫২

মৃত্যু : ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

“আমার হলো শুরু, তোমার হলো সারা”—সদ্যপ্রয়াত তরুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার ছাত্রজীবনে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি কলেজ-প্রাঙ্গনে। সেখানে আমার পদার্পণের পরের বছরেই তিনি স্নাতক হিসাবে বি.ই. কলেজ, শিবপুরের পাঠ শেষ করেন। ১৯৭৯ সালে পূর্ত দপ্তরে যোগ দেবার আগে তিনি স্বল্পকাল আসামে একটি নির্মাণ-সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সহকর্মী হিসাবে পূর্ত (সড়ক) বিভাগে আমার কাজ করার সুযোগ মিলেছিল আশির দশকের শেষদিকে একবার আবার নব্বইয়ের দশকের শেষে আরেকবার।

বিশিষ্ট প্রকৌশলী প্রাক্তন মুখ্য বাস্তুকার তরুণ ভট্টাচার্য অজাতশত্রু, অতি সজ্জন ও প্রিয়ভাষী হিসাবে সবার প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেতু-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর নৈপুণ্যের ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য তিনি সেতু পরিকল্পনা মন্ডলের তৎকালীন অধীক্ষক বাস্তুকার ও বিশিষ্ট সেতু-বিশেষজ্ঞ প্রয়াত শঙ্কর দত্তের খুবই আস্থাভাজন ছিলেন। তৎকালীন এসিস্ট্যান্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ার অগ্রজস্থানীয় প্রিয়ব্রত রায় একদা আমাকে তাঁর দৃষ্টান্ত দিয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলেন—তরুণ কাজের মাধ্যমে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে, তুমিও তার মতো হবার চেষ্টা করো। বলা বাহুল্য এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তাঁর নৈপুণ্য ও অগ্রণী ভূমিকা সর্বদাই অনস্বীকার্য।

ভবানী ভবনের নবনির্মিত ভবনের মূলত তিন তলায় ও অন্যত্র কর্মরত সদ্য-তরুণ আমাদের দলবলের স্বভাব-চাপল্যের সঙ্গে অন্তর্মুখী তরুণদা তাল মেলানোর পথে মোটেই না গেলেও, সর্বদাই সন্মোহ প্রশ্রয়ের চোখে দেখতেন। বেশির ভাগ সময়ে স্বভাবত তিনি খানিক উদাসীন ও বিযাদমগ্ন আপাতভাবে মনে হলেও, প্রকৃতই অগ্রজের মতো আচরণ করতেন। দেখামাত্রই তিনি সর্বদা স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা এবং দপ্তর-সংক্রান্ত ও বহির্ভূত নানা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরের কথোপকথনে যেন কাছছাড়া করতে চাইতেন না। এখন মনে হয় তাঁর কয়েকজন প্রিয়পাত্রের উপরে হয়ত এমন পক্ষপাত ছিলো। আমাদের যাবতীয় সমস্যা তাঁকে নিঃসঙ্কোচে বলা যেতো।

বিশিষ্ট প্রকৌশলী হওয়া সত্ত্বেও তরুণ ভট্টাচার্য নিজের দরজা-জানলা খোলা রাখা পছন্দ করতেন—নিজের অধিগত বিষয়ের বাইরেও নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও চর্চা ছিলো। পূর্ত দপ্তরের কর্মজীবনে তিনি উত্তরবঙ্গে একবার একটি নকশাভুক্তির নির্বাহী বাস্তুকার হিসাবে ও দ্বিতীয় বার সেখানে নর্দান সার্কেলের অধীক্ষক বাস্তুকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। দপ্তরে সুনামের সঙ্গে একজন দৃঢ়চেতা আধিকারিক হিসাবে কাজ করে তিনি মুখ্য বাস্তুকার পদে উন্নীত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন ২০১২ সালে। এই পত্রিকা পূর্তকথাতে আমার “হাতে খড়ির” পিছনে তাঁরই ভূমিকা সক্রিয় ছিল। এক দুপুরে অফিসে তাঁর ঘরে তিনি আমাকে বললেন—পূর্তকথায় এটা লেখ তো! প্রসঙ্গটি ছিলো এই—এমন দ্রুতগতিতে যদি সমস্ত মোরাম বা ইটপাতা রাস্তাগুলিকে পিচের পাকা রাস্তায় রূপান্তরিত করা হয়, তাহলে এক সময়ে এই বিপুল মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ-ব্যয়ের সঙ্কুলান কোথা থেকে হবে? আপাত-কঠিন নির্লিপ্ততার আড়ালে তরুণদার একটি স্বল্পজ্ঞাত কোমল মন ছিল। উত্তর কলকাতার বনেদিয়ানার তিনি ছিলেন একজন উত্তরসূরী। স্টার থিয়েটারের পিছনে একটি সংকীর্ণ রাস্তার প্রান্তে একটি সাবেকি বাড়িতে খানিক সাবেকি রীতিতে তিনি বাস করতেন। বিশেষভাবে এক বিকেলের কথা মনে পড়ে—যেদিন ঐ পাড়ারই কোন প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে ট্রামলাইনের পাশ দিয়ে দ্রুত ধাবমান পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত তাঁর মুখোমুখি পড়ে যাই। তক্ষুনি আমাকে সস্ত্রীক প্রায় গ্রেপ্তার করে নিজের বাড়ির দোতলায় নিয়ে গিয়ে মিস্ত্রিমুখ করিয়ে তবে ছাড়লেন। সর্বোপরি তীক্ষ্ণধী এই মানুষটি তাঁর সমকালীন পরিপার্শ্বের তুলনায় এক অর্থে অগ্রসর ছিলেন। পূর্ত দপ্তরে যখন সদ্য এক দুটি যন্ত্রগণকের দেখা মিলেছে, তখনই “Learning Computer Application” বিষয়ে তাঁর একটি তথ্যসমৃদ্ধ, মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় The Construction Engineer পত্রিকায়। সম্প্রতি তরুণ ভট্টাচার্য আমাদের ছেড়ে গিয়ে পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তনীদের মননশীলতার জগৎকে হয়তো খানিক রিভলুশন করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পরিশেষে একান্ত অনুরোধ যে—কোনও পাঠক বা শুভানুধ্যায়ীর কাছে তাঁর উল্লেখিত প্রবন্ধটি থাকলে, সেটির একটি অনুলিপি আমাদের কাছে পাঠালে সম্পাদকমন্ডলী একান্ত কৃতজ্ঞ থাকবে।

—কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়



পূর্ত বিভাগের প্রাক্তন মুখ্য স্থপতি চিন্ময় ঘোষ ১৪ মে'২৫ বিকেল ৫টায়  
হাইকোর্ট অনুমোদিত রাজ্যের প্রথম মধ্যস্থতাকারী স্থপতি হিসাবে  
হাইকোর্ট অডিটোরিয়ামে মাননীয় চিফ জাস্টিসের হাত থেকে শংসাপত্র নিচ্ছেন।

পূর্ত কথা | ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা | জুন - সেপ্টেম্বর ২০২৫

